الله ما لا اعلم — অর্থাৎ এ দুদিন এমন যাহা আল্লাহ্ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ দুদিন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত এবং আল্লাহ্ পাকের গ্রন্থের যে বিষয় সম্পর্কে অবহিত নই সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করি (ইহা আবদুর রাজ্জাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তা বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন)।

দুনিয়ার সকল বস্তুই মূলত উত্তম ও কল্যাণকর, অকল্যাণ ও অপকৃষ্টতা শুধু তার ভ্রান্ত ব্যবহারের কারণেঃ اَلَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ অর্থাৎ যিনি যাবতীয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর ও নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ বিশ্ব-জগতে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা এ জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলোপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এ প্রতিটি বস্তুই মূলত এক বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী। এদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ও সুন্দর করে মানবকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন ইরশাদ করেছেনঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি মানবকে অতি সুন্দর গঠন ও উত্তম আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু বাহ্যত যত অশ্লীল ও অকল্যাণকরই মনে হোক না কেন—কুকুর, শূকর সাপ, বিচ্ছু, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি বিষধর ও হিংস্র জন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে অকল্যাণকর বলে মনে হয়। কিন্তু, গোটা বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনায় এগুলো কোনটাই অপকৃষ্ট অমঙ্গলকর নয়। জনৈক কবি বলেনঃ

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

বিশ্বমাঝারে পাবে না কিছু অকেজো অসার
অকর্মা হেথা নাহি কিছু লীলাক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ।।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র) বলেছেন যে, যাবতীয় মৌলিক এবং আনুষঙ্গিক বস্তু كُلَّ شَيْءٍ-এর অন্তর্গত। অর্থাৎ যে সব বস্তু মৌলিক সত্তার অধিকারী ও দৃশ্যমান যথা—প্রাণীজগত, উদ্ভিদ জগত, জড় জগত প্রভৃতি এবং আনুষঙ্গিক অদৃশ্য বস্তু যথা, স্বভাব-চরিত্র ও আমলসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি যেগুলো কুচরিত্র ও কুস্বভাব বলে কথিত যথা, ক্রোধ, লোভ, যৌন কামনা প্রভৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে খারাপ নয়। যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহৃত না হওয়ার দরুন এগুলো অপকৃষ্ট ও অকল্যাণকর প্রতিপন্ন হয়। যথাস্থলে ব্যবহৃত হলে এগুলোর কোনটাই খারাপ ও অমঙ্গলজনক নয়। কিন্তু এ দ্বারা এসব বস্তুর সৃষ্টিগত দিকই উদ্দেশ্য—যা নিঃসন্দেহে শুভ ও সুন্দর কিন্তু আমলের অপর দিক মানব কর্তৃক তা সাধন ও অর্জন—অর্থাৎ কোন কাজ সম্পর্কে

নিজস্ব ইচ্ছা নিয়োজিত করা। এ দিক দিয়ে সবকিছু শুভ ও সুন্দর নয়, আল্লাহ্ পাক যেগুলো করতে অনুমতি দেননি সেগুলো সুন্দর ও কল্যাণকর নয়; অশ্লীল ও অপকৃষ্ট।

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ—ইতিপূর্বে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বস্তু অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। অতপর এর মাঝে সর্বাধিক সুদর্শন ও মনোরম মানুষের আলোচনা করেছেন। এর সাথে তাঁর পূর্ণ ও অনন্য ক্ষমতা প্রকাশার্থে এ কথাও ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানবকে আমি সর্বোত্তম সেরা সৃষ্টি করে তৈরী করেছি। তার সৃষ্টি উপকরণ সর্বোন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট বলে সে শ্রেষ্ঠ নয়। বরং তার সৃষ্টি উপকরণ তো নিকৃষ্টতম বস্তু—বীর্য। অতপর তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও অসাধারণ সৃষ্টিকৌশল প্রয়োগ করে এই নিকৃষ্টতম বস্তুকে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন সেরা সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন।

وَقَالُوٓا ءَإِذَا ضَلَلْنَا فِى الْأَرْضِ ءَإِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ
هُم بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِى
وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ الْمُجْرِمُونَ
نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا
نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا
وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ إِنَّا نَسِينَٰكُمْ
وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ
بِآيَٰتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑰
اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۭ لَا يَسْتَوٗنَ ⑱ اَمَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۭ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ⑲ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا
اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ
الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ⑳ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى
دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ㉑ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ
بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ۭ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ㉒

(১০) তারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়ে গেলেও পুনরায় নতুন করে সৃজিত হব কি? বরং তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করে। (১১) বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি। (১৩) আমি ইচ্ছে করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জ্বিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। (১৪) অতএব এ দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজা আস্বাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী আযাব ভোগ কর। (১৫) কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। (১৬) তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তার ডাকে ভয়ে ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (১৭) কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। (১৮) ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। (১৯) যারা

ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন-স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (২০) পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর। (২১) গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (২২) যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে জালিম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং এসব (কাফিরগণ) বলে যে, আমরা যখন মাটিতে (মিশে) একেবারে বিলীন হয়ে যাবো তখন কি আমরা (কিয়ামতের দিন) আবার নবজন্ম লাভ করবো (এদের বাহ্যিক কথাবার্তায় বোঝা যায় যে, তারা কিয়ামত দিবসের পুনরুত্থান ও পুনর্মিলন সম্পর্কে কেবল বিস্ময়ই প্রকাশ করছে না) বরং (প্রকৃত প্রস্তাবে) এসব লোক স্বীয় পালনকর্তার সন্দর্শন সম্বন্ধেও অবিশ্বাসী (এবং আলোচ্য আয়াতে استفهام —প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার অস্বীকৃতি প্রকাশার্থেই ব্যবহৃত হয়েছে) আপনি (উত্তরে) বলে দিন যে, (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) মৃত্যু সংঘটন কার্যের নির্ধারিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন; তৎপর তোমরা স্বীয় পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। (উত্তরের মাঝে আসল উদ্দেশ্যই এই تُرْجَعُوْنَ —প্রত্যাবর্তিত হবে এবং ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মাঝখানে يَتَوَفّٰكُمْ —তোমাদের মৃত্যু ঘটবে একথা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—ফেরেশতার মাধ্যমে তোমাদের প্রাণবিয়োগও ঘটবে—যাঁরা প্রাণ বের করার সময় তোমাদেরকে মারধরও করবেন। যেমন অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ الخ -

অর্থাৎ হে নবী, আপনি যদি ফেরেশতাগণ কর্তৃক কাফিরদের মুখমণ্ডল (শরীরের সম্মুখাংশ) ও পশ্চাদাংশে আঘাত করে করে মৃত্যু ঘটানোর করুণ অবস্থা দেখতে পেতেন। সুতরাং মৃত্যুর পরিণতি কেবল মাটির সাথে মিশে যাওয়াই নয়. যেমন তোমাদের উক্তি ءَاِذَا ضَلَلْنَا الخ দ্বারা বোঝা যায় এবং তাদের—প্রত্যাবর্তিত হওয়া-কালীন অবস্থা) যদি আপনি দেখতে পেতেন—যখন এসব অপরাধীগণ (নিজ কৃতকর্মের জন্য চরমভাবে

লজ্জিত হয়ে) স্বীয় পালনকর্তার সম্মুখে নতশিরে (দাঁড়িয়ে) থাকবে (এবং বলতে থাকবে) হে আমাদের পালনকর্তা (এখন) আমাদের চোখ-কান খুলে গেছে (এবং পয়গম্বরগণ যে কথা বলেছেন তা সবই সত্য ছিল) সুতরাং আমাদেরকে (পৃথিবীতে) আবার প্রেরণ করুন। আমরা (এবার গিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে) সৎকাজ করবো। (এখন) আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে। এবং (তাদের এরূপ বক্তব্য সম্পূর্ণ অসার প্রতিপন্ন হবে। কেননা) যদি আমি এরূপ ইচ্ছা করতাম (যে তারা অবশ্যই সঠিক পথ লাভ করুক) তবে আমি প্রত্যেক লোককে তার (মুক্তি ও কল্যাণের) রাস্তা (ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো রূপ স্তর পর্যন্ত) অবশ্যই প্রদান করতাম (যে তারা অবশ্যই সঠিক পথ লাভ করুক) তবে আমি প্রত্যেক লোককে তার (মুক্তি ও কল্যাণের) রাস্তা (ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো রূপ স্তর পর্যন্ত) অবশ্যই প্রদান করতাম (যেরূপভাবে তাদেরকে কাম্য পথ প্রদর্শনার্থে হিদায়ত প্রদান করেছি।) কিন্তু আমার এই (চিরন্তন সুনির্ধারিত) কথা (অগণিত হিকমত দ্বারা) সপ্রমাণিত যে, আমি নরককে মানব-দানব উভয়ের (মধ্যে যারা কাফির তাদের দ্বারা) অবশ্যই পরিপূর্ণ করে দেব। (এবং কতক হিকমতের বর্ণনা সূরায়ে হুদের শেষ ভাগে অনুরূপ আয়াতের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে।) তখন (তাদেরকে বলা হবে) এখন তোমরা যে দিনের সন্দর্শন সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়েছিলে তার আস্বাদ গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের বিস্মৃত হলাম (অর্থাৎ করুণা ও দয়া থেকে বঞ্চিত করে দেওয়াকে বিস্মৃত হয়ে গেছে বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং) আমি যে তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করতে বলেছি তা কেবল দু-এক দিনের জন্য নয়। (বরং এর নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে,) স্বীয় পাপ কর্মসমূহের বদৌলতে চিরন্তন শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর। (এ তো হলো কাফিরদের অবস্থা ও পরিণতি। পরবর্তী পর্যায়ে মু'মিনগণের অবস্থা ও তাদের পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ) আমার আয়াতসমূহের প্রতি কেবল তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে যাদেরকে যখনই এসব আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখনই তারা সিজদায় পড়ে যায় (যার বিশ্লেষণ পূর্বে সূরায়ে মরিয়মের চতুর্থ রুকূতে করা হয়েছে) এবং স্বীয় পালনকর্তার প্রশংসা-স্তুতি করতে থাকে এবং তারা (ঈমান লাভের দরুন) অহংকার করে না। (যেমনটি হয় কাফিরদের বেলায়—وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا—গর্বস্ফীত হয়ে অবজ্ঞাভরে মুখমণ্ডল ফিরিয়ে রাখে। এ তো তাদের বক্তব্য-বিশ্বাস ও চরিত্রগত অবস্থা। এবং তাদের আমলের অবস্থা এই যে, রাতের বেলায়) তাদের (শরীরের) পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকে (ইশার ফরযের কারণে হোক বা তাহাজ্জুদের কারণে, এর ফলে সকল রেওয়ায়েতের সমন্বয় সাধিত হলো। কেবল আলাদাই থাকে না, বরং) এরূপভাবে (আলাদা থাকে) যে, তারা স্বীয় পালনকর্তাকে (সওয়াবের) আশায় এবং (শাস্তির) ভয়ে আহবান করতে থাকে (নামায, দোয়া ও যিক্‌র সবই এর অন্তর্ভুক্ত) এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দান করেছি তা হতে ব্যয় করে। (সারকথা এগুলো মু'মিনগণের গুণাবলী। তন্মধ্যে কতকগুলো এমন যেগুলোর উপর মূল ঈমান নির্ভর করে এবং কতকগুলোর

উপর ঈমানের পরিপূর্ণতা নির্ভর করে) সুতরাং এদের জন্য অদৃশ্য ভাণ্ডারে এদের চোখ সুশীতল ও পরিতৃপ্তকারী কি সব বস্তু বিদ্যমান রয়েছে, তা কেউ অবগত নয়। এগুলো তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ লাভ করবে। (এবং যখন উভয় দলের অবস্থা ও পরিণাম ফল জানতে পেলে) তবে (এখন বল তো) যে বিশ্বাস স্থাপনকারী সে অপকৃষ্ট দুষ্কৃতিকারীদের অনুরূপ হতে পারে কি? তারা পরস্পর (অবস্থাগত ও পরিণামগত কোনভাবেই) সমতুল্য হতে পারে না (যা জানাও গেছে। বিশেষ করে পরিণামগত অসমতুল্য হওয়ার বর্ণনা বিশেষ অবগতির জন্য আবার শুনে নাও যে) যেসব লোক ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে (পরকালে) স্বর্গোদ্যানই তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান। যা তারা তাদের কৃত সৎকাজের বিনিময়ে আতিথ্য স্বরূপ লাভ করবে (অর্থাৎ অতিথি-বৃন্দের ন্যায় এসব বস্তু বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে লাভ করবে—অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুকের ন্যায় গ্লানি ও অমর্যাদার সাথে নয়) এবং যারা নির্দেশ অমান্যকারী, অবাধ্য, তাদের বাসস্থান নরক। যখন তারা এখান থেকে বের হতে চাইবে (এবং এতদুদ্দেশ্যে কিনারাভিমুখে অগ্রসর হবে। যদিও অত্যন্ত গভীর ও দ্বার রুদ্ধ হওয়ার দরুন বের হওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু সে সময়ে তাদের এরূপ স্বাভাবিক গতিবিধির পর) পুনরায় তাদেরকে ধাক্কা মেরে ঠেলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা সেই নরকাগ্নির শাস্তি আস্বাদন কর—যা তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেতে (কিন্তু অঙ্গীকারকৃত শাস্তি তো পরকালে হবে এবং) নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে (পরকালে অঙ্গীকারকৃত) বৃহত্তর শাস্তির পূর্বে নিকটতর (অর্থাৎ ইহকালে) শাস্তি প্রদান করবো (যথা, রোগব্যাধি, বিপদাপদ প্রভৃতি। কেননা কোরআনের বর্ণনানুযায়ী অসুখ-বিসুখ, বিপদাপদ প্রধানত মানবকৃত কুকর্মের কারণেই আসে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ ..... لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ——এতদসত্ত্বেও যারা সাবধান হয়ে ফিরে আসবে

না তাদের জন্য বৃহত্তর শাস্তিই রয়েছে। এ প্রকৃতির লোকের প্রতি শাস্তি প্রয়োগে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই) কেননা সে ব্যক্তি হতে অধিকতর অত্যাচারী কে—যাকে স্বীয় পালনকর্তার আয়াতসমূহের সাহায্যে উপদেশ প্রদান করা সত্ত্বেও উহা থেকে বিমুখ থাকে। (সুতরাং এদের শাস্তির যোগ্য হওয়া সম্পর্কে কি সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে? তাই) আমি এরূপ অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ——পূর্ববর্তী আয়াতে কিয়ামত

অস্বীকারকারীগণের প্রতি সতর্কবাণী এবং মৃত্যুঅন্তে মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কে তাদের যে বিস্ময়—তার উত্তর ছিল। এ আয়াতে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যদি চিন্তাভাবনা কর তবে এতে আল্লাহ্ পাকের কুদরতে কামেলা ও অনন্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাবে। তোমরা নিজ অজ্ঞানতা

ও নির্বুদ্ধিতাবশত একথা মনে কর যে, মৃত্যু আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়; কিন্তু ব্যাপার এমনটি নয়—বরং আল্লাহ্ পাকের নিকটে তোমাদের মৃত্যুর এক নির্দিষ্ট ক্ষণ রয়েছে; এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এক বিশেষ ব্যবস্থাপনাও নির্ধারিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে আজরাঈল (আ)-এর ভূমিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সমস্ত প্রাণীজগতের মৃত্যু তাঁর উপর ন্যস্ত, যে ব্যক্তির মৃত্যু যখন এবং যে স্থান নির্ধারিত রয়েছে ঠিক সে সময়েই তিনি তার প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন। আলোচ্য আয়াতে এর বর্ণনাই রয়েছে। এখানে ملك الموت এক বচনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপর এক আয়াতে রয়েছে اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ—অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায়—এখানে ملئكة বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আজরাঈল (আ) একাকী এ কাজ সম্পন্ন করেন না—বহু ফেরেশতা তাঁর অধীনে এ কাজে অংশগ্রহণ করেন।

আত্মবিয়োগ ও মালাকুল মউত সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ ঃ প্রখ্যাত মুফাস্সির মুজাহিদ বলেন, মালাকুল মউতের সম্মুখে গোটা বিশ্ব কোন ব্যক্তির সম্মুখে রক্ষিত বিভিন্ন খাবার সামগ্রীপূর্ণ একটা থালার ন্যায়—তিনি যাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি এক 'মারফূ' হাদীসেও আছে (ইমাম কুরতুবী 'তাযকিরা'তে ইহা বর্ণনা করেছেন)। অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী (সা) একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মালাকুল-মউতকে দেখে বললেন যে, আমার সাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার করো। মালাকুল-মউত উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন—আমি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বলেন যে, যত মানুষ গ্রাম-গঞ্জে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে বা সমুদ্রে বসবাস করছে—আমি এদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচবার দেখে থাকি এজন্য এদের ছোট-বড় প্রত্যেক সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরি জ্ঞাত। অতঃপর বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)! এগুলো যা কিছু হয় সব আল্লাহ্র হুকুমে। অন্যথায় আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত আমি কোন মশারও প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে সক্ষম নই।

মালাকুল-মউতই কি অন্যান্য জীবজন্তুরও প্রাণবিয়োগ ঘটান? ঃ উল্লিখিত হাদীসের রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের অনুমতি সাপেক্ষে মশার মৃত্যুও মালাকুল-মউতই ঘটায়। হযরত ইমাম মালিকও এক প্রশ্নের উত্তরে এ রকমই বলেন। কিন্তু অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের দ্বারা আত্মার বিয়োগ ঘটানো কেবল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট—কেবল তার মান-মর্যাদা রক্ষার্থে—অন্যান্য জীব-জন্তু আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে ফেরেশতাগণের মাধ্যম ব্যতীতই আপনা-আপনিই মৃত্যু-বরণ করবে।—(কুরতুবী'র বরাত দিয়ে ইবনে আতিয়া বর্ণনা করেন)

এ বিষয়ই আবুশশায়েখ, উকাইলী, দায়লামী প্রমুখ হযরত আনাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেন যে, জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গ সবই আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা স্তুতিতে মগ্ন (এ-ই এগুলোর জীবন)। যখন এদের গুণ কীর্তন

বন্ধ হয়ে যায় তখনই আল্লাহ্ পাক এদের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। জীব-জন্তুর মৃত্যু মালাকুল-মউতে'র উপর ন্যস্ত নয়। ঠিক একই মর্মে এক হাদীস হযরত ইবনে উমর (রা) থেকেও বর্ণিত আছে।---(মাযহারী)

অপর এক আয়াতে রয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ পাক আযরাঈল (আ)-এর উপর গোটা বিশ্বের মৃত্যু সংঘটনের দায়িত্ব অর্পণ করেন তখন তিনি (আযরাঈল) আরয করেন; হে প্রভু, আপনি আমার উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করলেন যার ফলে বিশ্ব-জগৎ ও গোটা মানবজাতি আমাকে ভর্ৎসনা করবে এবং আমার প্রসংগ উঠলে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করবে। প্রত্যুত্তরে হক তা'আলা বললেনঃ আমি এর সুরাহা এরূপভাবে করেছি যে, জগতে রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য রূপে মৃত্যুর কিছু বাহ্যিক কারণ রেখে দিলাম যার ফলে প্রত্যেক মানুষ সেসব উপলক্ষ ও রোগ-ব্যাধিকে মৃত্যুর কারণরূপে আখ্যায়িত করবে এবং তুমি তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাবে।---(কুরতুবী)

ইমাম বগভী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন---যত প্রকারের রোগ-ব্যাধি ক্ষত ও আঘাত রয়েছে---এসবই মৃত্যুর দূত---মানুষকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতপর যখন মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে আসে তখন মালাকুল-মউত মৃত্যুপথযাত্রীকে সম্বোধন করে বলেন, ওগো আল্লাহ্র বান্দা, আমার আগমনের পূর্বে তোমাদেরকে সাবধান করে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমি রোগ ব্যাধি ও দুর্যোগ-দুর্বিপাক রূপে কত সংবাদ কত দূত পাঠিয়েছি। এখন আমি পৌঁছে গেছি। এরপর আর কোন সংবাদ প্রদানকারী বা কোন দূত আসবে না। এখন তুমি স্বীয় প্রভুর নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করবে---চাই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক।---(মাযহারী)

মাস'আলা ঃ কারো আত্মা বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত মালাকুল-মউত কারো মৃত্যুক্ষণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।---(আহমদ কর্তৃক মা'মার থেকে বর্ণিত ---মাযহারী)

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির, মুশরিক ও কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি সতর্কবাণী ছিল। অতপর (إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا) থেকে খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের বিশেষ গুণাবলী ও তাদের সুমহান মর্যাদাসমূহের বর্ণনা রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে মু'মিনগণের এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ পাকের যিক্র ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করে। কেননা এরা আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর করুণা ও পুণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে যিক্র ও দোয়ার জন্য ব্যাকুল করে তোলে।

তাহাজ্জুদের নামায ঃ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে যিকর ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও নফল নামায—যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। (এ প্রসঙ্গে হযরত হাসান, মুজাহিদ, মালিক ও আওযায়ীর বক্তব্যও ঠিক একই রূপ) এবং হাদীসের অপরাপর রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত মায়ায ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন যে, আমি একদা নবীজীর সংগে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি তাঁর (নবীজীর) সন্নিকটে গেলাম এবং আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা), আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন, যার মাধ্যমে আমি বেহেশত লাভ করতে পারি এবং দোযখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ্ পাক যার তরে তা সহজ-লভ্য করে দেন তার জন্য তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফে হজ্জ সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন—এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, (তা এই যে,) রোযা ঢাল স্বরূপ। (যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়) এবং সদকা মানুষের পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের নামায। এই বলে কোরআন মজীদের উল্লিখিত আয়াত تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ الخ তিলাওয়াত করেন।

হযরত আবুদ্দারদা (রা), কাতাদাহ (রা) ও যাহহাক (রা) বলেন যে, সেসব লোকও শয্যা থেকে শরীরের পার্শ্বদেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যারা ইশা ও ফজর উভয় নামায জামা'আতের সাথে আদায় করেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বিশুদ্ধ সনদসহ বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াত تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ الخ যারা ইশার নামাযের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, ইশার জামা'আতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল নামায আদায় করে করে কাটান (মুহাম্মদ বিন নসর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন।) এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, যে ব্যক্তি শুয়ে, বসে বা পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায় চোখ উন্মিলনের সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের যিক্রে লিপ্ত হন, তাঁরাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে কাসীর ও অন্যান্য তফসীরকার বলেছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে শেষরাতের নামাযই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। 'বয়ানুল কোরআনেও' ইহাই গ্রহণ করা হয়েছে।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন—কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ পাক পূর্ববর্তী মানবমণ্ডলীকে একত্রিত করবেন তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক আহবানকারী, যার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে, দাঁড়িয়ে আহবান করবেন,—হে হাশর ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী! আজ তোমরা অবহিত হতে পারবে যে, আল্লাহ্ পাকের নিকটে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কে? অনন্তর সে ফেরেশতা تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ الخ যাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে) এরূপ-গুণের অধিকারী লোকগণকে দাঁড়াতে আহবান জানাবেন। এ আওয়াজ শুনে এসব লোক দাঁড়িয়ে পড়বেন—যাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য—(ইবনে-কাসীর।) এই রেওয়ায়েতেরই কোন কোন শব্দে রয়েছে যে, এদেরকে হিসাব গ্রহণ ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে। অতপর অন্যান্য সমগ্র লোক দাঁড়াবে এবং তাদের থেকে হিসাব গ্রহণ করা হবে।—(মাযহারী)

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ—أدنى অর্থ নিকটতম عذاب الادنى (নিকটতম শাস্তি) বলে ইহলৌকিক বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধিকে বোঝানো হয়েছে এবং বৃহত্তম শাস্তি (عذاب الاكبر) বলতে পারলৌকিক শাস্তি বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহ্র দিকে যারা ফিরে আসে তাদের পক্ষে ইহলৌকিক বিপদাপদ রহমত-স্বরূপ ঃ এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্ পাক অনেক মানুষকে তাদের কৃত পাপের জন্য সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইহকালে তাদের উপর নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ও রোগ-ব্যাধি চাপিয়ে দেন। যেন তারা সতর্ক হয়ে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পরকালের কঠিনতম শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, পাপীদের প্রতি দুনিয়াতে আপতিত বিপদ-আপদ ও জরা-ব্যাধি এক প্রকারের রহমত স্বরূপ—যার ফলে স্বীয় নির্লিপ্ততা ও অসাবধানতা থেকে ফিরে এসে পরকালের গুরুতর শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। অবশ্য যে সব লোক এরূপ দুর্যোগ দুর্বিপাক সত্ত্বেও আল্লাহ্র প্রতি ধাবিত না হয়—তাদের পক্ষে এটা দ্বিগুণ শাস্তি, একটা দুনিয়াতেই নগদ, দ্বিতীয়টা পরকালের কঠিনতম শাস্তি। কিন্তু

নবী ও ওলীগণের ওপর যে বিপদাপদ আসে, তাঁদের ব্যাপার এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এগুলো তাঁদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরূপ—যার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা উন্নত হতে থাকে। তার লক্ষণ ও পরিচয় এই যে, এরূপ বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধির সময়ও তাঁরা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকারের আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকেন।

কতক অপরাধের শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই হয়ে যায়ঃ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ---বাহ্যত প্রত্যেক শ্রেণীর অপরাধকারী مجرمين শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে চাই ইহকালের হোক চাই পরকালের--- উভয় এর অন্তর্গত। কিন্তু হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে তিন ধরনের শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই পেয়ে যায়। (১) ন্যায় ও সত্যের বিপক্ষে পতাকা তুলে প্রকাশ্য-ভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ, (২) পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও অবাধ্যতা প্রদর্শন, (৩) অত্যাচারীর সহযোগিতা করা (হযরত মাআয বিন জাবাল থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন)।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ
هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا
لَمَّا صَبَرُوْا ۛ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ
اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۗ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ۗ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى
الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ۗ
اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٨﴾
قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ
يُنْظَرُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿٣٠﴾

(২৩) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, অতএব আপনি কোরআন প্রাপ্তির বিষয়ে কোন সন্দেহ করবেন না। আমি একে বনী ইসরাঈলের জন্য পথপ্রদর্শক করেছিলাম। (২৪) তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। (২৫) তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে, আপনার পালনকর্তাই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন। (২৬) এতে কি তাদের চোখ খোলেনি যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদের বাড়িঘরে এরা বিচরণ করে। অবশ্যই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তারা কি শোনে না? (২৭) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উদ্গত করি, যা থেকে ভক্ষণ করে তাদের জন্তুরা এবং তারা। তারা কি দেখে না? (২৮) তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হলে বল; কবে হবে এই ফয়সালা? (২৯) বলুন, ফয়সালার দিনে কাফিরদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। (৩০) অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয়ই আমি (আপনার ন্যায় হযরত) মূসা (আ)-কেও গ্রন্থ প্রদান করেছিলাম (যা প্রচার করতে গিয়ে তাঁকে বহু দুঃখ-যন্ত্রণা বরদাস্ত করতে হয়েছিল। সুতরাং আপনারও তা বরদাস্ত করা উচিত। এক সান্ত্বনা তো এই! অনন্তর অনুরূপভাবে আপনাকেও ঐশী গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে।) সুতরাং আপনি (আপনার) এ গ্রন্থ লাভ করা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না। (যেমন আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ —নিশ্চয় আপনাকে কোরআন প্রদান করা হবে। সুতরাং আপনি ঐশী গ্রন্থের অধিকারী এবং আল্লাহ্ কর্তৃক রসূলরূপে সম্বোধিত ব্যক্তি। আপনি যখন এরূপভাবে আল্লাহ্র নিকটে মনোনীত, তখন যদি গুটিকয়েক নির্বোধ আপনাকে গ্রহণ না করে তবে বিচলিত ও দুঃখিত হওয়ার কিছুই নেই। এও এক প্রকার সান্ত্বনা) এবং আমি সেই (মূসা আ-র) গ্রন্থকে ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্য পথ প্রদর্শক করেছিলাম। (অনুরূপভাবে আপনার গ্রন্থের মাধ্যমেও অনেকে হিদায়তপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং আপনি প্রসন্ন থাকুন। এও এক প্রকার সান্ত্বনা) এবং আমি সেই ইসরাঈল বংশীয়দের মধ্যে বহুসংখ্যক ধর্মীয় অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলাম---যারা আমার নির্দেশ মত সঠিক পথ প্রদর্শন করতো। যখন তারা দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং আয়াতসমূহের উপর স্থির বিশ্বাসী ছিল। (তাই তারা সেগুলো প্রচার ও প্রসার এবং সৃষ্টিকুলের হিদায়ত করতে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট বরণ করতো। এতে রয়েছে মু'মিনগণের জন্য সান্ত্বনা যে, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। যখন তোমরা বিশ্বাসের অধিকারী এবং বিশ্বাস চায় ধৈর্য ধারণ---তাই তোমাদের পক্ষে ধৈর্য ধারণ

অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ সময়ে আমি তোমাদেরকেও ধর্মীয় অধিনায়ক করে দেব। এ তো ইহলৌকিক সান্ত্বনা এবং তোমাদের এক পারলৌকিক সান্ত্বনাও ধারণ করা উচিত। সে সান্ত্বনার বস্তু এই যে) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন সেসব বিষয়ের (বাস্তব ও কার্যকর) মীমাংসা করে দেবেন যেগুলো সম্পর্কে তারা পরস্পর মতবিরোধ করছিল। অর্থাৎ মু'মিনগণকে বেহেশত এবং কাফিরদেরকে নরকে নিক্ষেপ করবেন এবং কিয়ামতও খুব দূরে নয়। এ থেকেও সান্ত্বনা লাভ করা উচিত। এ বক্তব্য শুনে কাফিরেরা দু'প্রকারের সন্দেহ পোষণ করতে পারত।---প্রথমত আমরা এ কথাই বিশ্বাস করি না যে কুফরী আল্লাহ্‌র নিকটে অপছন্দনীয়---যেমন يفصل ---তিনি মীমাংসা করবেন,----শব্দ দ্বারা বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত----আমরা কিয়ামত সংঘটিত হওয়াই অসম্ভব বলে মনে করি। সামনে উভয় সন্দেহ অপনোদনের জন্য দুটি পৃথক বক্তব্য পেশ করা হয়েছে---১. কুফরী গর্হিত ও অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে যে তারা সন্দেহ পোষণ করে; তবে কি একথা তাদের পথ প্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট নয় যে, আমি তাদের পূর্বে (শিরক ও কুফরের জন্য) কত জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি! (অর্থাৎ তাদের ধ্বংস প্রক্রিয়া থেকে এবং নবীর ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক স্বাভাবিক রীতি ভংগ করে সংঘটিত হওয়া থেকে খোদার রোষাগ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল---যদ্দ্বারা কুফরী যে নিন্দিত ও গর্হিত তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এসব লোক যাদের বসবাসের স্থানসমূহের (সিরিয়া ভ্রমণকালে) যাতায়াত করে (অতিক্রম) করে। এ ক্ষেত্রে (কুফরী গর্হিত হওয়ার) সুস্পষ্ট লক্ষণাদি বিদ্যমান রয়েছে। এরা কি অতীত কালের জনমণ্ডলীর ধ্বংস সংশ্লিষ্ট কাহিনীসমূহ শুনতে পায় না (যা বহুল প্রচারিত ও সর্বজনবিদিত ও আলোচিত। দ্বিতীয় বিষয়---কিয়ামত সংঘটন সম্পর্কে তাদের সন্দেহ পোষণ।) তবে কি তারা এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করছে না যে, আমি (মেঘমালা ও নদীনালা প্রভৃতির মাধ্যমে) বিশুষ্ক ভূমিতে পানি পৌঁছিয়ে থাকি এবং তার সাহায্যে শস্যাদি উৎপাদন করে থাকি---যাহা হতে তাদের (গৃহপালিত) পশুসমূহ এবং তারা নিজেও ভক্ষণ করে থাকে। তবে তারা কি (দিবারাত্রি) এসব কিছু অবলোকন করছে না? (এ হলো মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। যেমন পূর্বেও কয়েক জায়গায় তার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সুতরাং উভয় সন্দেহের অবসান ঘটলো এবং) এরা (কিয়ামত ও বিচারের বর্ণনা শুনে বিস্ময়ভরে বিদ্রূপাত্মক সুরে) বলে যে যদি তোমরা (তোমাদের এ কথায়) সত্য হয়ে থাকো তবে (বল তো) এ মীমাংসা কবে সম্পন্ন হবে? আপনি বলে দিন যে (তোমরা তো অহেতুকভাবে এর তাকীদ দিচ্ছ। তোমাদের জন্য তো তা হবে কঠিন বিপদের দিন। কেননা) সে মীমাংসার দিনে কাফিরদেরকে তাদের ঈমান (মোটেও) কোন সুফল প্রদান করবে না। (এবং তাদের অব্যাহতি লাভের একই পথ ছিল তাও হাতছাড়া) আর, (অব্যাহতি লাভ তো দূরের কথা, সে শাস্তি হতে এক মুহূর্তের তরেও) তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না। সুতরাং [হে নবী (সা)] আপনি (বিদ্রূপাত্মক) কথাবার্তার প্রতি (মোটেও) লক্ষ্য করবেন না (যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে সন্ত্রাস ও মনোকষ্টের উদ্রেক করবে।

এবং আপনি (প্রতিশ্রুত মীমাংসার) প্রতীক্ষায় থাকুন (কিন্তু সত্বর জানা যাবে যে, কার প্রতীক্ষা বাস্তবানুগ এবং কারটা নয়। যেমন তাদের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ পাকের উক্তি ঃ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ--অর্থাৎ আপনি বলে দিন--- তোমরা প্রতীক্ষারত থাক; অনন্তর আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকবো।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ --- لقاء শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ----এ আয়াতে কার সাথে কার সাক্ষাৎ বোঝানো হয়েছে সে সম্বন্ধে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 'তফসীরের সার-সংক্ষেপে' لِقَائِهِ-র 'যমীর' (সর্বনাম) কিতাব----অর্থাৎ কোরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে মহান আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-কে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না। যেরূপভাবে কোরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ ----অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় আপনাকে কোরআন প্রদান করা হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং কাতাদাহ্ (রা)-র ব্যাখ্যা এরূপভাবে করেছেন যে, لِقَائِهِ -র যমীন (সর্বনাম) হযরত মূসা (আ)-র দিক ধাবিত হয়েছে। এ আয়াতে হযরত মূসা (আ)-র সাথে রসূলুল্লাহ্র (সা) সাক্ষাতের সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, হযরত মূসা (আ)-র সাথে আপনার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে। সুতরাং মি'রাজের রাতে এক সাক্ষাতকার সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত; অতপর কিয়ামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে।

হযরত হাসান বসরী (র) এর ব্যাখ্যা এরূপভাবে করেছেন যে, হযরত মূসা (আ)-কে ঐশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেরূপভাবে মানুষ তাঁকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছে এবং নানাভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়েছে, আপনিও এসব কিছুর সম্মুখীন হবেন বলে নিশ্চিত থাকুন। তাই কাফিরদের প্রদত্ত দুঃখ-যন্ত্রণার ফলে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না; বরং নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা বরদাশত করুন।

কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচালক ও নেতা হওয়ার দুটি শর্ত ঃ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ---অর্থাৎ,

আমি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে কিছু লোককে নেতা ও অগ্রপথিক নিযুক্ত করেছিলাম, যারা তাঁদের পয়গম্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মহান প্রভুর নির্দেশানুসারে লোকদেরকে হিদায়ত করতেন---যখন তাঁরা ধৈর্য ধারণ করতেন এবং আমার বাণীসমূহের উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন করতেন।

ইসরাঈল বংশের ওলামাগণের মধ্য হতে কতককে যে জাতির নেতা ও পুরোধার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে, তার দুটি কারণ রয়েছে। এ আয়াতে সে দুটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে---১. ধৈর্য ধারণ করা, ২. আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা। আরবী ভাষায় সবর করার অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। এর শাব্দিক অর্থ অনড় ও দৃঢ়বদ্ধ থাকা। এখানে সবর দ্বারা আল্লাহ্ পাকের আদেশসমূহ পালনে অটল ও দৃঢ়পদ থাকা এবং আল্লাহ্ পাক যে সব বস্তু বা কাজ হারাম ও গর্হিত বলে নির্দেশ করেছেন, সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা। শরীয়তের যাবতীয় নির্দেশই এর অন্তর্গত---যা এক বিরাট কর্মগত দক্ষতা ও সাফল্য। এর দ্বিতীয় কারণ আল্লাহ্ পাকের আয়াতসমূহের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন---আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবণ করা এবং অনুধাবনান্তে তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা---উভয়ই এর অন্তর্গত। এটা এক বিরাট জ্ঞানগত দক্ষতা ও সাফল্য।

সারকথা, আল্লাহ্ পাকের নিকটে নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্যের যোগ্য কেবল সেসব লোকই, যারা কর্ম ও জ্ঞান--উভয় দিকে পূর্ণতা লাভ করেছে। এ স্থলে কর্মগত পূর্ণতা ও দক্ষতাকে জ্ঞানগত পূর্ণতা ও দক্ষতার পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ জ্ঞানের স্থান স্বভাবত কর্মের পূর্বে; এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিকটে কর্মহীন শিক্ষা ও জ্ঞানের কোন মূল্য নেই।

ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে কিছুসংখ্যক ওলামার মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। তা এই ঃ-بالصبر و اليقين تنال الامامة فى الدين---অর্থাৎ ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করা যায়।

---أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا

অর্থাৎ, তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি যদ্দ্বারা নানা প্রকারের শস্য সমুদগত হয়। جرز শুষ্ক ভূমিকে বলা হয়---যেখানে কোন বৃক্ষলতা উদগত হয় না।

ভূমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা ঃ শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহের, অনন্তর সেখানে নানাবিধ উদ্ভিদ ও তরুলতা উদগত হওয়ার বর্ণনা কোরআনে করীমের বিভিন্ন জায়গায় এরূপভাবে করা হয়ে যে---ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়---ফলে ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্থলে

ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে শুষ্ক ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা উদগত করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ অন্য কোন ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যেসব শুষ্ক ভূ-ভাগে সাধারণত বৃষ্টি হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়।

এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, কতক ভূমি এমন নরম ও কোমল হয় যে, তা বৃষ্টি বহন করার যোগ্যও নয়।---যেখানে পুরোপুরি বৃষ্টি বর্ষিত হলে দালান-কোঠা বিধ্বস্ত হবে, গাছপালার মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে। তাই এরূপ ভূমি সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যে, অধিক পরিমাণে বৃষ্টি কেবল সেসব ভূমিতেই বর্ষিত হয় যেগুলো তা বহন করার যোগ্যতা রাখে। অতপর পানি প্রবাহিত করে এমন ভূমি অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় যেগুলোর বৃষ্টি বহনের ক্ষমতা নেই।---যেমন মিসরের ভূমি। কিছু সংখ্যক তফসীরকার ইয়ামনের ও শামের কতক ভূমি এরূপ বলে বর্ণনা করেছেন।---যেমন ইবনে আব্বাস ও হাসান (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সকল ভূমি এর অন্তর্ভুক্ত। মিসরের ভূমি বিশেষভাবে এর অন্তর্গত---সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ হতে বৃষ্টির পানি নীল নদ দিয়ে মিসরে পৌঁছে---সাথে করে সেখানকার অত্যন্ত উর্বর লাল পলিমাটি বহন করে আনে। তাই মিসরবাসিগণ সেখানে বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর নতুন পানি ও পলিমাটি দ্বারা উপকৃত হয়।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ---অর্থাৎ কাফিররা পরিহাসছলে বলে থাকে যে, আপনি কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিমগণের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন সংঘটিত হবে?---আমরা তো এর কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।---আমরা তো মুসলমানদেরকে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে আত্মগোপন করে থাকতে দেখি।

এর উত্তরে হক তা'আলা ফরমান ঃ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ----অর্থাৎ আপনি তাদের প্রত্যুত্তরে একথা বলে দিন যে, তোমরা যে আমাদের বিজয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছো, সেদিন তোমাদের জন্য তা সমূহ বিপদ বহন করে আনবে। কেননা, যখন আমরা বিজয় লাভ করবো সেদিন তোমরা কঠিন শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। চাই ইহকালে হোক যেমন বদরের যুদ্ধে বা পরকালে এবং যে মুহূর্তে কারো উপর আল্লাহ্র শাস্তি আপতিত হয় তখন তার ঈমান আর গৃহীত হয় না।---(ইবনে-কাসীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।

কোন কোন বিজ্ঞজন مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ –এর অর্থ কিয়ামতের দিন বলে বর্ণনা করেছেন। উপরে 'তফসীরের সার-সংক্ষেপ' অংশে তাই গ্রহণ করা হয়েছে।

سورة الاحزاب

সূরা আহযাব

মদীনায় অবতীর্ণ, ৯ রুকূ, ৭৩ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝١ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝٢ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝٣

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ।

(১) হে নবী! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন এবং কাফির ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (২) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন। (৩) আপনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে নবী! আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকুন---(অন্য কাউকে ভয় করবেন না ---এবং তাদের ধমকের প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করবেন না।) এবং কাফির (যারা প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে) ও মুনাফিকদের (যারা গোপনে তাদের সাথে একমত পোষণ করে) অনুসরণ করবেন না এবং তাদের কথার প্রতি কর্ণপাতও করবেন না (বরং কেবল আল্লাহ্‌রই নির্দেশ পালন করবেন)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান (তাঁর প্রতিটি নির্দেশ নানাবিধ কল্যাণ ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ) এবং (আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের অর্থ এই) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে যে আদেশ করা হয়েছে, তা অনুসরণ করুন। (এবং হে মানব সন্তান) আল্লাহ্ পাক নিঃসন্দেহে তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। (তোমাদের

মাঝে যারা আমার নবীর বিরোধিতা করছে আমি তাদের সম্পূর্ণ হিসাব (নেব) এবং (হে নবী) আপনি (তাদের এরূপ ধমকী ও ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে) মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। আর কার্যনির্বাহী অভিভাবকরূপে আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট। (এর মুকাবিলায় এদের যাবতীয় চক্রান্ত ও কূট-কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ ব্যাপারে আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। আর যদি আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষাচ্ছলে আপনার প্রতি কোন সাময়িক দুঃখ-কষ্ট পৌঁছে তবে কোন ক্ষতি নেই বরং এতে কল্যাণই নিহিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এটা মাদানী সূরা। এর অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় আল্লাহ্ পাক সমীপে রসূলুল্লাহ্‌র (সা) বিশিষ্ট স্থান ও উচ্চ মর্যাদা সংশ্লিষ্ট। এ সূরার বিভিন্ন শিরোনামায় রসূল (সা)-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবশ্যকতা এবং তাঁকে দুঃখ-যন্ত্রণা দেওয়া হারাম হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। সূরার অবশিষ্ট বিষয়সমূহও এগুলোরই পরিপূরক ও সহায়ক।

শানে নুযূল ঃ এ সূরা নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের পর যখন মদীনায় তশরীফ নিয়ে যান, তখন মদীনার আশেপাশে কুরায়জা, নযীর, বনূ কায়নুকাহ্ প্রভৃতি কতিপয় ইহুদী গোত্র বসবাস করত। রাহমাতুল্লিল-আলামীনের এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব লোক মুসলমান হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এসব ইহুদীর মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি নবীজীর (সা) খিদমতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা রূপ ধারণ করে নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো সহজতর হবে মনে করে নবীজী এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদেরকে স্বাগতম জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন এবং ছোট-বড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমনকি ওদের দ্বারা কোন অশালীন ও অসংগতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হলে পরও ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে সেগুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরায়ে আহযাবের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।—(কুরতুবী)

ইবনে জারীর (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অপর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হিজরতের পর ওয়ালীদ বিন মুগীরা, মুগীরা ও শায়বা বিন রাবীয়াহ্ মদীনায় পৌঁছে মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে হুযূরে পাকের খিদমতে এ প্রস্তাব পেশ করেন যে, যদি আপনি ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন তবে আমরা আপনাকে মক্কার অর্ধেক সম্পদ প্রদান করবো। আবার মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীগণ এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, যদি তিনি নিজ দাবী ও দাওয়াত

থেকে বিরত না থাকেন তবে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো। এমতাবস্থায় এ আয়াত-সমূহ নাযিল হয়।---(রূহুল-মা'আনী)

সা'লাবী ও ওয়াহেদী এক তৃতীয় ঘটনা সনদহীনভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় মক্কার কাফিরগণ ও নবীজীর মাঝে 'যুদ্ধ নয় চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যখন আবূ সুফিয়ান, ইকরামা বিন আবূ জেহেল ও আবুল আ'ওয়ার সালামী মদীনায় পৌঁছে নবীজীর খিদমতে নিবেদন করতো যে, আপনি আমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ পরিহার করুন---এবং কেবল একথা বলুন যে, (পরকালে) এরাও সুপারিশ করবে এবং উপকার ও কল্যাণ সাধন করবে। যদি আপনি এমনটি করেন তবে আমরাও আপনার পালনকর্তার নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করবো।---এভাবে আমাদের পারস্পরিক বিবাদ মিটে যাবে।

তাদের এ কথা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সমস্ত মুসলমানের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় বোধ হলো। মুসলমানগণ এদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নবীজী (সা) ইরশাদ করলেন যে, আমি এদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ বলে এমনটি হতে পারে না। ঠিক এই সময় এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়।---(রূহুল মা'আনী)

এসব রেওয়ায়েত যদিও বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। এসব ঘটনা ও উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হতে পারে।

এ আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি দুটো নির্দেশ রয়েছে---প্রথম. اِتَّقِ اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভয় কর, দ্বিতীয়. — لَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ — অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করো না। আল্লাহ্কে ভয় করার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব লোককে হত্যা করা চুক্তিভঙ্গের শামিল---যা সম্পূর্ণ হারাম এবং কাফিরদের কথা অনুসরণ না করার নির্দেশ এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, এ সব ঘটনা সম্পর্কে কাফিরদের যা মতামত, তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসছে।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ ——ইহা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান যে, সমগ্র কোরআনের কোথাও তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। যেমনটি অন্যান্য নবীকে সম্বোধনের বেলায় করা হয়েছে। যেমন---يا ادم - يا موسى - يا نوح يا ابراهيم প্রভৃতি। বরং খাতামুন্নাবিয়্যিন (সা)-কে কোরআন পাকের যেখানেই সম্বোধন করা হয়েছে---তাঁর উপাধি---নবী বা রসূল প্রভৃতির মাধ্যমে করা হয়েছে। কেবল চার জায়গায়, তিনি যে রসূল তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে---যা একান্ত জরুরী ছিল।

এস্থলে আঁ হযরত (সা)-কে সম্বোধন করে দুটো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে---এক, আল্লাহ্ পাককে ভয় করার---অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা যেন লংঘন করা না হয়, দুই---মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদীদের মতামত গ্রহণ না করার। প্রশ্ন হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তো যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। চুক্তি ভংগ করা মহাপাপ (কবীরা গোনাহ্) এবং উপরে শানে-নুযুল প্রসংগে কাফির মুশরিকদের যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা তো মারাত্মক পাপ; আর তিনি (নবীজী) এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ---সুতরাং এ নির্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? রূহুল মা'আনীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এসব নির্দেশের অর্থ ভবিষ্যতে এগুলোর উপর স্থির থাকা---যেমনভাবে তিনি এ ঘটনার সময়ও এসব হুকুমের উপর অটল ছিলেন এবং اتق الله--এর নির্দেশ প্রথম উল্লেখ করার কারণ এই যে, মুসলমানগণ শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ মক্কার মুশরিকদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করছিল। সুতরাং চুক্তি লংঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য اتق الله-এর মাধ্যমে প্রথম হিদায়ত করা হয়েছে। অপরপক্ষে যেহেতু কোন মুসলমান মুশরিক---কাফিরদের অনুসরণের ইচ্ছাও পোষণ করতেন না, তাই এর উল্লেখ পরে বলা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য গোটা উম্মত---তিনি তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, ---তাঁর দ্বারা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণের কোন আশংকাই ছিল না। কিন্তু বিধান গোটা উম্মতের জন্য এবং সেটা বর্ণনার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, সম্বোধন করা হয়েছে রসূলুল্লাহ (সা)-কে---যার ফলে হুকুমের গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। কেননা, যে বিষয়ে আল্লাহ্র রসূলকেও সম্বোধন করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে কোন মানুষই এর আওতা-বহির্ভূত থাকতে পারে না।

ইবনে-কাসীর বলেন যে, এ আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের অনুসরণ থেকে বারণ করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন তাদের সাথে কোন ব্যাপারে পরামর্শ না করেন---তাদেরকে অত্যধিক ওঠা-বসা, মেলা-মেশার সুযোগ না দেন। কেননা, এদের সহিত অত্যধিক মেলামেশা ও পরামর্শ করা অনেক সময় এদের কথা গ্রহণ করার কারণরূপে পরিণত হতে পারে। সুতরাং যদিও নবীজীর পক্ষে তাদের কথা গ্রহণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা এবং নিজের পরামর্শে তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান থেকেও নবীজীকে বারণ করা হয়েছে। পরন্তু এ-ক্ষেত্রে اطاعت (অনুসরণ করা) শব্দ এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, এরূপ পরামর্শ ও পারস্পরিক সম্পর্কে স্বভাবত তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং এস্থলে পরোক্ষভাবে হলেও তাদের মতামত কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পারে; এরূপ কোন সুযোগও যাতে না হয় তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, উল্লিখিত আয়াতে কাফিরদের পক্ষ থেকে শরীয়ত বিরোধী ও হকের পরিপন্থী উক্তি অতি স্বাভাবিক এবং সেগুলোর অনুসরণ না করার নির্দেশও একান্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মুনাফিকগণ যদি আপনার নিকটে প্রকাশ্যভাবে কোন ইসলাম বিরোধী উক্তি করে, তবে তো তারা আর মুনাফিক থাকে না---পরিষ্কার কাফির হয়ে যায়---এমতাবস্থায় তাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলার প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তর এই হতে পারে যে, মুনাফিকগণ একেবারে স্পষ্টভাবে তো ইসলাম বিরোধী কোন উক্তি করতো না, কিন্তু অন্যান্য কাফিরের সমর্থনে কথা বলতো।

শানে নুযুল প্রসঙ্গে মুনাফিকদের যে ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি এটাকেই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে ধরে নেয়া হয়, তবে তো কোন কথাই থাকে না। কেননা এ ঘটনানুযায়ী যেসব ইহুদী কপটভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে তাদের সাথে বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে নবীজীকে বারণ করা হয়েছে।

এ আয়াতের উপসংহার إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا---বলে, আল্লাহ্‌কে ভয় করার এবং কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ না করার পূর্ব বর্ণিত যে হুকুম তার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা যে আল্লাহ্ যাবতীয় কর্মের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়---মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও মংগল তাঁর পরিজ্ঞাত। একথা এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফির ও মুনাফিকদের কোন কোন কথা এমনও ছিল যদ্দ্বারা অন্যায়-অশান্তি লাঘব এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সদ্ভাবপূর্ণ পরিবেশ স্থাপন এরূপ, অন্যান্য কল্যাণ ও উপকার সাধনে সহায়ক হতো। কিন্তু এদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণও মংগলের পরিপন্থী বলে হক তা'আলা নবীজীকে তা করতে বারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর পরিণাম শুভ নয়।

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا---

ইহা পূর্ববর্তী হুকুমেরই অবশিষ্টাংশ---যেন আপনি কাফির ও মুনাফিকদের কথায় পড়ে তাদের অনুসরণ না করেন, বরং ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু পৌঁছেছে, আপনি সাহাবায়ে কিরামসহ কেবল তাই অনুসরণ করুন। যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম ও সমগ্র মুসলমানই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। তাই বহুবচন ক্রিয়া بِمَا تَعْمَلُونَ ব্যবহার করে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا---ইহাও পূর্ববর্তী হুকুমের সমাপনী অংশ বিশেষ। ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি এসব লোকের কথায় পড়ে কোন কাজে উদ্যোগী হবেন না, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনে কেবল আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা

করুন। কেননা অভিভাবকরূপে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর বর্তমানে আপনার অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।

মাস'আলা ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, দীন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কাফিরদের পরামর্শ গ্রহণ করা জায়েয নয়। অবশ্য অভিজ্ঞতাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণে কোন দোষ নেই।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ
اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ
اَبْنَآءَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
السَّبِيْلَ ﴿٤﴾ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ
لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۭ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَكَانَ
اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥﴾

---

(৪) আল্লাহ্ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেন নি। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 'জিহার' কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেন নি এবং তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেন নি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ্ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। (৫) তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহ্র কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ পাক কারো বক্ষাভ্যন্তরে দু'টি অন্তকরণ তৈরী করেন নি এবং (অনুরূপভাবে) তোমরা যে সব স্ত্রীকে মা সম্বোধন কর তাদেরকে তোমাদের মায়ে পরিণত করেন নি এবং (অনুরূপভাবে জেনে রাখ যে,) তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে প্রকৃত পুত্রেও পরিণত করেন নি। এটা তোমাদের নিছক মৌখিক বাক্য (যা অলীক—বাস্তবের সাথে

সঙ্গতিহীন) এবং আল্লাহ্ পাক সত্য কথা বলেন এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করেন। (এবং যখন পোষ্য পুত্র তোমাদের প্রকৃত পুত্র নয় কাজেই) তোমরা এদেরকে (পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করো না বরং) এদের (প্রকৃত) পিতৃগণের নামে আহবান কর। আল্লাহ্র নিকট ইহাই সুসঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃগণের পরিচয় না জান তবে তাদেরকে তোমাদের ভাই বা বন্ধু বলে সম্বোধন কর। (কেননা তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধু) আর এ ব্যাপারে তোমাদের যে ভুলত্রুটি হয়েছে তাতে কোন পাপ হবে না। কিন্তু হ্যাঁ, যা তোমরা অন্তর থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বলতে (তাতে অবশ্যই পাপ হবে) এবং (এ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাও ক্ষমা হয়ে যাবে কেননা) আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি কাফির ও মুনাফিকদের পরামর্শানুযায়ী কাজ না করা ও তাদের কথায় কর্ণপাত না করার নির্দেশ রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কাফিরদের মাঝে প্রচলিত তিনটি কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। প্রথমত বর্বর যুগে আরববাসিগণ অসাধারণ মেধাবী লোকের বক্ষাভ্যন্তরে দুটি অন্তকরণ আছে বলে মনে করত। দ্বিতীয়ত নিজ পত্নীগণ সম্পর্কে এ প্রথা বিরাজমান ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তার মার পিঠ বা অন্য কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করে বলতো যে, তুমি আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের সমতুল্য, যাকে তাদের পরিভাষায় 'জিহার' বলা হতো, তবে 'জিহার'কৃত সে স্ত্রী তার কাছে চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যেত। ظهار এর উৎপত্তি ظهر থেকে---যার অর্থ-পিঠ।

তৃতীয়ত তাদের মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর কারো পুত্রকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করত, তবে এ পোষ্য পুত্র তার প্রকৃত পুত্র বলেই পরিচিত হতো; এবং তারই পুত্র বলে সম্বোধন করা হতো; এ পোষ্য পুত্র সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রেরই মর্যাদাভুক্ত হতো। যথা---তারা প্রকৃত সন্তানের ন্যায়ই মীরাসের অংশীদার হতো এবং বংশ ও রক্তগত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব নারীর সাথে বিয়ে-শাদী হারাম---এ পোষ্য পুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরূপই মনে করা হতো। যেমন---বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার পরও ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেরূপ হারাম, অনুরূপভাবে পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীও সে ব্যক্তির পক্ষে হারাম বলে মনে করা হতো।

বর্বর যুগের এই তিনটি ভ্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথার মধ্যে প্রথমটি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইসলামী শরীয়তে একে রদ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এটা তো একান্তই শরীরতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যাপার যে, মানুষের বক্ষাভ্যন্তরে একটি অন্তকরণ থাকে, না দু'টি অন্তকরণ থাকে। এর স্পষ্ট অসারতা সর্বজনজ্ঞাত। এজন্য সম্ভবত এর অসারতার বর্ণনা অপর দুটো বিষয়ের সমর্থনে ভূমিকা স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বর্বর যুগের অধিবাসীদের মানুষের বক্ষ মাঝে দু'টি অন্তকরণ আছে বলে যে বিশ্বাসের অসারতা ও

অযৌক্তিকতা যেমন সাধারণ-অসাধারণ সর্বজনবিদিত, অনুরূপভাবে তাদের 'জিহার' ও পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক।

অবশিষ্ট দুটি বিষয়---জিহার ও পালক পুত্রের হুকুম---এগুলো এমন সব সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, ইসলামে যেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ পাক যার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটি-নাটি পর্যন্ত কোরআনে প্রদান করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মত নিছক মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তার বিশ্লেষণের ভার নবীজী (সা)-র উপর ন্যস্ত করেননি। এ দু'ব্যাপারে বর্বর আরবগণ নিজেদের খেয়াল খুশীমত হালাল-হারাম ও জায়েয-না-জায়েয সংশ্লিষ্ট স্বকীয় কল্পনাপ্রসূত বিধি-বিধান প্রণয়ন করে রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করে যা প্রকৃত সত্য, তা উদ্‌ঘাটন করে দেওয়া সত্য ধর্ম ইসলামের অবশ্য কর্তব্য ছিল---তাই বলা হয়েছে ঃ—وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰئِىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ—

---অর্থাৎ এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে মায়ের সদৃশ বলে ঘোষণা করে তবে তার পক্ষে সে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যায়। তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে স্ত্রী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তোমাদের প্রকৃত মা তো সে-ই, যার উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ।

এ আয়াতে 'জিহারের' দরুন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার অন্ধকার যুগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরীয়তের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে 'সূরায়ে মুজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি জিহারের কাফ্‌ফারা আদায় করে, তবে স্ত্রী তার তরে হালাল হয়ে যাবে। 'সূরায়ে মুজাদালায়' জিহারের কাফ্‌ফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে ঃ

দ্বিতীয় বিষয় পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ—أَدْعِيَاءَ—دَعِىٌّ এর বহুবচন, যার পালক ছেলে---আয়াতের মর্ম এই, যেমন কোন মানুষের দুটি অন্তকরণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না; অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হয় না অর্থাৎ অন্য সন্তানদের ন্যায় সে মীরাসেরও অংশীদার হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাস'আলাসমূহও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম, কিন্তু পোষ্য পুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমনভাবে হারাম হবে না।

যেহেতু এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে, সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে বা তার উল্লেখ করবে তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে

না। কেননা এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উদ্ভবের আশংকা রয়েছে।

বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ বিন হারিসা (রা)-কে যায়েদ বিন মুহাম্মদ (সা) বলে সম্বোধন করতাম। [কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে পালক ছেলে-রূপে গ্রহণ করেছিলেন।] এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরি-ত্যাগ করি।

মাস'আলা ঃ এর দ্বারা বোঝা যায়, অনেকে যে অপরের সন্তানকে নিজ পুত্র বলে আহবান করে তা যদি নিছক স্নেহপরবশজনিত হয়---পালক পুত্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে না হয় তবে যদিও জায়েয, কিন্তু তবুও বাহ্যত যা নিষিদ্ধ, তাতে জড়িত হওয়া সমীচীন নয়।---(রূহুল বায়ান, বায়যাবী)

এ ব্যাপারটা কুরায়শদেরকে চরম বিভ্রান্তিতে ফেলে এক গুরুতর পাপে লিপ্ত করে রেখেছিল। এমন কি নবীজী (সা)-কে পর্যন্ত এ অপবাদ দেওয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিল যে, তিনি নিজ পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন। অথচ যায়েদ (রা) তাঁর সন্তান ছিলেন না বরং পালকপুত্র ছিলেন, যার বিবরণ এ সূরাতে পরে আছে।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا
الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ
اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ
مَسْطُوْرًا ۝٦

(৬) নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী মু'মিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে চাও, করতে পার। এটা লওহে-মাহ্ফুজে লিখিত আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নবী (সা) বিশ্বাসিগণের সাথে তাদের নিজেদের চাইতেও নিবিড় সম্পর্ক রাখেন (কেননা মানুষ স্বয়ং তার উপকার ও ক্ষতি উভয়ই সাধন করতে পারে। কারণ মানব হৃদয় যদি কলুষমুক্ত থেকে সঠিক পথে চলে, সৎকাজে আকৃষ্ট হয়, তবে তো উপকার

ও কল্যাণ ; কিন্তু যদি পাপকর্মে ধাবিত হয় তবে নিজ সত্তাই তার জন্য সমূহ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে নবীজীর শিক্ষা-দীক্ষা মানবের তরে কেবল কল্যাণ ও মঙ্গলই আনয়ন করে। হৃদয় যদি কলুষমুক্তও থাকে এবং সঠিক পথেই ধাবিত হয়, তবুও এর লাভ নবীজীর লাভ ও উপকারের তুল্য হতে পারে না। কেননা, মানবমন ও বিবেক শুভ-অশুভ, কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে পড়ার আশংকাও রয়েছে। আর মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কেও পুরোপুরি জ্ঞানও তার নেই। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত শিক্ষায় কোন বিভ্রান্তির আশংকা নেই। যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সা) মানবের তরে তাদের স্বীয় জন-প্রাণের চাইতেও অধিকতর উপকার ও কল্যাণ সাধনকারী, সুতরাং আমাদের উপর তাঁর অধিকার আমাদের প্রাণের চাইতে বেশী এবং এ অধিকার হলো আমাদের প্রতিটি কাজে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা ও তাঁর প্রতি সমগ্র সৃষ্টিকুলের চাইতে বেশী শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা)। আর নবী-পত্নীগণ তাঁদের (মু'মিনগণের) মা (অর্থাৎ উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মু'মিনগণের আধ্যাত্মিক পিতা। যিনি তাদের প্রতি তাদের নিজের চাইতেও অধিক দরদী ও স্নেহপরায়ণ। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ তাদের মায়ে পরিণত হলেন। অর্থাৎ তাঁরা মায়ের অনুরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভের অধিকারিণী।

এ আয়াতে নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে সুস্পষ্টভাবে মুসলিম জাতির মা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পরোক্ষভাবে আধ্যাত্মিক পিতা বলে আখ্যায়িত করার ফলে পোষ্য পুত্রকে পালক পিতার প্রতি সম্বোধন করার দরুন যেরূপ সন্দেহের উদ্রেক করত, এক্ষেত্রেও অনুরূপ সন্দেহের উদ্রেক করতে পারত; যার ফলশ্রুতি স্বরূপ সমগ্র মুসলিমের মাঝে পরস্পর আপন ভাই-বোনের সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাওয়ায় আপসে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয়ে যেত এবং মীরাসের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক মুসলমান অপরের উত্তরাধিকারে পরিণত হতো। এ সন্দেহ অপনোদনের জন্য আয়াতের উপসংহারে বলে দেয়া হয়েছেঃ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ الاية — অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনগণ আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে (শরীয়তের বিধানানুযায়ী মীরাসের ক্ষেত্রে) অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা পরস্পর নিবিড়তর সম্পর্ক রাখে। কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের (ঐ) বন্ধুগণের সাথে (অসিয়তের মাধ্যমে) কোন সদ্ব্যবহার ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে চাও তবে তা জায়েয আছে। এ কথাটি লাওহে মাহ্ফুযে লিপিবদ্ধ রয়েছে (যে হিজরতের সূচনা-পর্বে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে মুহাজিরগণকে আনসারদের মীরাসের অংশীদার করে দেয়া হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তী সময়ে মীরাসের বাটোয়ারা আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে সংঘটিত হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, "সূরায়ে আহযাবের" অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া হারাম হওয়া সংশ্লিষ্ট। সূরার প্রারম্ভে মুশরিক ও মুনাফিকদের প্রদত্ত জ্বালা-যন্ত্রণার বর্ণনা দেওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রাসঙ্গিক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল। অতপর অন্ধকার যুগের তিনটি অযৌক্তিক প্রথার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে শেষ কুপ্রথাটি সম্পর্কে আলোচনার একটি সম্পর্ক নবীজীকে যন্ত্রণাদান সংশ্লিষ্ট ছিল। কেননা কাফিরগণ হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী পুণ্যবতী যয়নব (রা)-এর সাথে নবীজীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার কালে বর্বরযুগের এই পোষ্য পুত্র জনিত কুপ্রথার ভিত্তিতে এরূপ অপবাদ দেয় যে, তিনি নিজ ছেলের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত নবীজীকে যন্ত্রণা প্রদান-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতে সমস্ত সৃষ্টিকুলের চাইতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাঁর অনুসরণ অধিক প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ الخ

اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ---এর যে মর্ম তফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, তা ইবনে আতিয়াহ্ (ابن عطية) প্রমুখের অভিমত---যা কুরতুবী ও অধিকাংশ তফসীরকার গ্রহণ করেছেন, যার সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আপনার (সা) নির্দেশ পালন করা স্বীয় পিতা-মাতার নির্দেশের চাইতেও অধিক আবশ্যকীয়। যদি পিতা-মাতার হুকুম তাঁর (সা) হুকুমের পরিপন্থী হয় তবে তা পালন করা জায়েয নয়। এমনকি তাঁর (সা) নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার চাইতেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সহীহ্ বুখারী প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূরে পাক (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به فى الدنيا والاخرة اقرأوا ان شئتم النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم

অর্থাৎ এমন কোন মু'মিনই নেই, যার পক্ষে আমি (সা) ইহকাল ও পরকালে সমস্ত মানবকুলের চাইতে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন নই। যদি তোমাদের মনে চায় তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কোরআনের আয়াত ঃ -اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ—পাঠ কর।

যার সারমর্ম এই যে, আমি প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানের জন্য গোটা সৃষ্টিকুলের চাইতে অধিক স্নেহপরায়ণ ও মমতাবান। একথা সুস্পষ্ট যে, এর অবশ্যম্ভাবী ফল

এরূপ হওয়া উচিত যে, নবীজীর প্রতি প্রত্যেক মু'মিনের ভালবাসা সর্বাধিক গভীর হওয়া বান্ছনীয়। যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين - بخارى، مسلم - مظهرى

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তার অন্তরে আমার ভালবাসা নিজ পিতা, নিজ সন্তান এবং সমস্ত মানব হতে অধিক পরিমাণে না হবে। (বুখারী, মুসলিম, মাযহারী)

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ—তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে উম্মতে মুসলিমার মা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ---ভক্তি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যায়ভুক্ত হওয়া। মা-ছেলের সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম, যথা---পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া। মুহরিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মীরাসে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন আয়াতের শেষে একথা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর নবীজীর শুদ্ধাচারিণী পত্নীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য এক আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়া মা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরী নয়।

মাস'আলা ঃ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীজীর পুণ্যবতী বিবি-গণের (রা) মধ্যে কারো প্রতি সামান্যতম বে-আদবী ও অশিষ্টাচারও এজন্য হারাম যে, তাঁরা উম্মতের মা। উপরন্তু তাঁদেরকে দুঃখ দিলে নবীজীকেও দুঃখ দেয়া হয়, যা চরমভাবে হারাম।

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ—শব্দগত অর্থানুযায়ী সকল আত্মীয়-স্বজনই এর অন্তর্ভুক্ত---চাই সেসব ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে ফকীহগণ 'আসাবাত' (عصبات) বলে আখ্যায়িত করেছেন যা যাদেরকে বিশেষ পরি-ভাষানুযায়ী 'আসবাতে'র মুকাবিলায় اولوا الارحام নামে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য কোরআনী আয়াতের মর্ম পরবর্তীকালে গৃহীত ফিকাহ্‌র এ পরিভাষা নয়।

সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তদীয় পত্নীগণের সাথে মুসলিম উম্মতের সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চাইতেও উন্নততর ও অগ্রস্থানীয় কিন্তু মীরাসের ক্ষেত্রে তাদের কোন স্থান নেই বরং মীরাস বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বন্টিত হবে।

ইসলামের সূচনাকালে মীরাসের অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। পরবর্তী সময়ে তা রহিত করে আত্মীয়তার সম্পর্ককেই অংশীদারিত্ব

নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেয়া হয়েছে। স্বয়ং কোরআন করীমই তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। এতদসংশ্লিষ্ট রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে সূরায়ে আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতে المؤمنين এর পরে আবার المهاجرين এর উল্লেখ এ ক্ষেত্রে তাঁদের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

কোন কোন মনীষীর মতে এ স্থলে মু'মিনীন' (مؤمنين) বলে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। এখানে 'মু'মিনীন' অর্থ যে আনসার, তা মুহাজিরীনের মুকাবিলায় 'মু'মিনীন' শব্দ ব্যবহার থেকে বোঝা যায়। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে মীরাসে অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী হুকুমের রহিতকারী (নাসেখ) বলে বিবেচিত হবে। কেননা নবীজী হিজরতের প্রারম্ভিককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নির্দেশও প্রয়োগ করে দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ সংশ্লিষ্ট সে হুকুমও রহিত করা হয়েছে---(কুরতুবী)

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا—অর্থাৎ উত্তরাধিকার তো কেবল আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে লাভ করা যাবে। কোন অনাত্মীয় উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু ঈমানী ভ্রাতৃত্বজনিত সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে---নিজ জীবদ্দশায়ও দান ও উপঢৌকন হিসেবে তাদেরকে প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য অসিয়তও করা যাবে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝٧ لِيَسْأَلَ
الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٨

(৭) যখন আমি পয়গম্বরগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম-তনয় ঈসার কাছ থেকে অংগীকার নিলাম এবং অংগীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অংগীকার---(৮) সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (সে ক্ষণটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য) যখন আমি সমস্ত পয়গম্বর থেকে (এ) অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম (যেন তাঁরা আল্লাহ্‌র আহ্‌কামের অনুসরণ করেন----সমগ্র সৃষ্টিকুলকে আল্লাহ্‌র পথে আহবান এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাও এর অন্তর্গত) এবং (সেসব পয়গম্বরগণের সাথে) আপনার নিকট হতেও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম (অনুরূপভাবে) নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ) থেকেও এবং (এটা কোন সাধারণ অঙ্গীকার ছিল না বরং) তাদেরকে অত্যন্ত সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছিলাম যেন (কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক) সেসব সত্যবাদী ব্যক্তির থেকে (অর্থাৎ, নবীগণ থেকে) তাদের সত্যপরায়ণতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন (যেন এর ফলে তাঁদের মান-মর্যাদা এবং অমান্যকারীগণের বিপক্ষে প্রয়োজনীয় দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই অঙ্গীকার ও তার অনুসন্ধান ক্রিয়া থেকে দুটো কাজ ওয়াজিব ---অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হলো। এক---যার উপর ওহী নাযিল হয় তাঁর পক্ষেও সে ওহীর অনুসরণ ওয়াজিব---দুই---সাধারণ লোকের উপর সাহেবে ওহী তথা ওহী-প্রাপ্ত পয়গম্বরের অনুসরণ ওয়াজিব) এবং কাফিরদের জন্য (যারা নবীর অনুসরণ থেকে পরান্মুখ) আল্লাহ্ পাক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরুতে নবী করীম (সা)-কে তাঁর উপর অবতরিত ওহী অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে واتبع ما يوحى اليك من ربك---অর্থাৎ আপনার উপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে যে ওহী অবতরিত হয়েছে, তা অনুসরণ করুন। আর পূর্ববর্তী আয়াত النبى اولى بالمؤمنين এর মাধ্যমে মু'মিনগণের উপর সাহেবে ওহী---পয়গম্বর (সা)-এর নির্দেশাবলী পালন করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটো কথাই আরো অধিক প্রমাণ ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়েও দুটি বিষয় বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সাহেবে ওহীর পক্ষে তাঁর উপর অবতরিত ওহীর এবং অন্যান্যদের পক্ষে সাহেবে ওহীর অনুসরণ করা ওয়াজিব অপরিহার্য।

নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ ঃ উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকুল থেকে গৃহীত সাধারণ অঙ্গীকার হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন মিশকাত শরীফে ইমাম আহমদ (র) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

خصوا بميثاق الرسالة والنبوة وهو قوله تعلى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم الاية -

অর্থাৎ রিসালত ও নবুয়তসংশ্লিষ্ট অঙ্গীকার নবী ও রসূলগণ থেকে স্বতন্ত্র-রূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যথা---আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ الاية

নবীগণ (সা) থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুয়ত ও রিসালত সংশ্লিষ্ট দায়িত্বসমূহ পালন এবং পরস্পর একে অপরের সত্যতা প্রকাশ ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কিত। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত কাতাদাহ (রা) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। পর এক রেওয়ায়েত অনুসারে একথাও নবীগণের (সা) এ অঙ্গীকারভুক্ত ছিল যেন তাঁরা সকলে এ ঘোষণাও করেন যে---محمد رسول الله لا نبى بعده---অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল, তাঁর পরে কোন নবী আসবেন না।

নবীগণের এ অঙ্গীকারও 'আযল' জগতে সেদিনই গ্রহণ করা হয়েছিল যেদিন সমগ্র মানবকুল থেকে الست بربكم এর অঙ্গীকার গৃহীত হয়েছিল।---(রূহুল-বায়ান ও মাযহারী)

وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ الاية--- সাধারণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা (সা) উল্লেখের পর পাঁচজনের নাম আবার বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীকুলের মধ্যে তাঁরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এদের মাঝে রসূলে মকবুল (সা)-এর আবির্ভাব সকলের শেষে হয়ে থাকলেও منك শব্দের মাধ্যমে নবীজীকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণ হাদীসের মধ্যে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

كنت اول الناس فى الخلق واخرهم فى البعث (رواه ابن سعد والبطرنى)---অর্থাৎ আমি (নবীকুলের মাঝে) সৃষ্টিগতভাবে সকলের আগে, কিন্তু আবির্ভাবগতভাবে নবুয়ত প্রাপ্তির দিক দিয়ে সকলের পরে।---(মাযহারী)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرًا ﴿٩﴾ اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ

زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۝١٠
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۝١١ وَاِذْ يَقُوْلُ
الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ
اِلَّا غُرُوْرًا ۝١٢ وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ
لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا
عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ۝١٣ وَلَوْ دُخِلَتْ
عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ
اِلَّا يَسِيْرًا ۝١٤ وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ۭ
وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ۝١٥ قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ
الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝١٦ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ
يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۭ وَلَا
يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝١٧ قَدْ يَعْلَمُ
اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَاۗىِٕلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ
الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝١٨ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَاۗءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ
يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ
فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۭ

أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرًا ﴿١٩﴾ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا
لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ
كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾
وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ
قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ لِيَجْزِيَ
اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ
عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ
صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ
فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا ۚ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

(৯) হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতপর আমি তাদের বিরুদ্ধে

ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (১০) যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। (১১) সে সময়ে মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। (১২) এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়। (১৩) এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। (১৪) যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। (১৫) অথচ তারা পূর্বে আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করেছিলে যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্র অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (১৬) বলুন! তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে। (১৭) বলুন! কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা? তারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাবে না। (১৮) আল্লাহ্ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এস। তারা কমই যুদ্ধ করে। (১৯) তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অতপর যখন বিপদ টলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মু'মিন নয়। তাই আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ। (২০) তারা মনে করে শত্রু বাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রু বাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, তবেই ভাল হত। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত। (২১) যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রসূলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (২২) যখন মু'মিনরা শত্রু বাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল। (২৩) মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই

পরিবর্তন করেনি। (২৪) এটা এজন্যে যাতে আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৫) আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন! আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২৬) কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। (২৭) তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান।

তফসীরের সা-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর বিভিন্ন সৈন্যদল চড়াও করেছিল---(অর্থাৎ 'উয়ায়না'র সৈন্যদল, আবূ সুফিয়ানের সৈন্যদল ও বনু কুরাইযার ইহুদী সৈন্যদল) অতপর আমি এক প্রচণ্ড ঝড় প্রেরণ করলাম (যা তাদেরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুললো এবং তাদের ছাউনীগুলোর মূলোৎপান করে দিল।) এবং (ফেরেশতার সমন্বয়ে গঠিত) এমন সেনাবাহিনী প্রেরণ করলাম, যা তোমরা (সাধারণভাবে) দেখতে পাওনি। (তবে কোন কোন সাহাবী যথা---হযরত হুযায়ফা (রা) কিছু সংখ্যক ফেরেশতাকে মানুষের আকৃতিতে দেখতেও পেয়েছিলেন। অবশ্য ফেরেশতাগণ সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি; বরং কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল) এক আল্লাহ্ পাক তোমাদের (সে সময়ের যাবতীয়) কার্যাবলী দেখতেছিলেন। (যে তোমরা অসাধারণ পরিশ্রম করে এক সুদীর্ঘ, প্রশস্ত ও গভীর পরিখা খনন করেছিলে এবং অতুলনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করে কাফিরদের মুকাবিলায় সম্পূর্ণ অনড় ও অটল ছিলে। আর তোমাদের এ কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের সাহায্য করছিলেন। এসব কিছু তখনই সংঘটিত হয়) যখন যেসব (শত্রু) পক্ষ তোমাদের উপরের দিক নিম্নদিক হতে (অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত করে) তোমাদের উপর চড়াও করেছিল। (অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় মদীনার নিম্নাঞ্চল থেকে এবং কোন সম্প্রদায় মদীনার উর্ধ্বাঞ্চল থেকে অগ্রসর হলো) এবং যখন তোমাদের চোখ (ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে) বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিলো এবং হৃদপিণ্ড ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ্ পাক সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করতেছিলে (যেমন দুর্যোগকালে স্বাভাবিকভাবে নানাবিধ ধারণার উদ্রেক হয়। এগুলো সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত বলে এতে কোন পাপ নেই; এবং তা বিশ্বাসীগণের পরবর্তী এ উক্তিরও পরিপন্থী নয়---

هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ অর্থাৎ, মহান আল্লাহ্

ও তাঁর রসূল যা সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে আমাদের নিকট অঙ্গীকার আগাম উক্তি করেছিলেন এ তো তাই এবং আল্লাহ্‌পাক ও তাঁর রসূল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্য বলেছিলেন। কেননা هٰذَا শব্দ দ্বারা সম্মিলিত শত্রুবাহিনী কর্তৃক মুসলমানদের উপর চড়াও করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু এ সংবাদ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছিল ; সুতরাং এটা সংঘটিত হওয়া ছিল স্থির নিশ্চিত। কিন্তু এ ঘটনার ফলাফল ও পরিণতি ব্যক্ত করা হয়নি। সুতরাং এতে জয়-পরাজয়ের উভয় সম্ভাবনাই ছিল।) এ স্থলে মু'মিনগণকে (পুরোপুরি) পরীক্ষা করা হয়েছিল (তাতে তাঁরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিলেন) এবং তাদেরকে প্রবল প্রকম্পে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এবং (এ ঘটনা সে সময় সংঘটিত হয়) যখন কপট বিশ্বাসীরা এবং যাদের অন্তকরণ (কপটতা ও দ্বিধা-শঙ্কার) ব্যাধিতে আক্রান্ত এরূপ বলতেছিল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদেরকে নিছক প্রতারণামূলক অঙ্গীকারই প্রদান করে রেখেছেন। (যেরূপ-ভাবে মু'আত্তাব বিন কোশায়ের ও তার সঙ্গীরা এরূপ উক্তি তখন করেছিল যখন পরিখা খননকালে কোদালের আঘাতে কয়েকবার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছিল এবং হুযূর (সা) প্রতিবারই ইরশাদ করছিলেন যে, আলোকরশ্মিতে আমি পারস্য, সিরিয়া ও রোমের রাজপ্রাসাদসমূহ দেখতে পাচ্ছি; এবং শীঘ্রই তা তোমাদের করতলগত হবে বলে আল্লাহ্ পাক ওয়াদা করেছেন। কিন্তু সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর সমাবেশের ফলে যখন মুসলমানগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন তখন এরা বিদ্রূপের সুরে বলাবলি করতে লাগল যে, অবস্থা তো এই অথচ রোম ও সিরিয়া বিজয়ের সুসংবাদ শোনানো হচ্ছে—এ তো নিছক প্রতারণা। মুনাফিকরা একে আল্লাহর ওয়াদা ও তাঁকে (সা) রসূল বলে বিশ্বাস না করা সত্ত্বেও তাদের এ উক্তি—مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন—নিছক উপহাস ও বিদ্রূপচ্ছলেই ছিল।) এবং (এ ঘটনা সে সময়ের) যখন সে সব মুনাফিকদের মাঝ থেকে কতিপয় লোক (রণক্ষেত্রে উপস্থিত অন্যান্যদেরকে) বলল—হে মদীনাবাসিগণ! এখানে তোমাদের টিকে থাকার অবকাশ নেই (কেননা এখানে অবস্থান করা নির্ঘাত মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং (নিজ নিজ বাড়িতে) ফিরে যাও। (আউছ বিন কাইতী আরো কিছু লোকসহ এরূপ উক্তি করেছিল) এবং সে সব মুনাফিকদের মাঝে কতক লোক নবী করীম (সা)-এর নিকটে (নিজ নিজ বাড়ি) ফিরে যাওয়ার জন্য এই বলে অনুমতি চাইতে লাগলো যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিত (অর্থাৎ কোলের শিশু ও নারীগণ রয়েছে—প্রাচীরগুলোও সে রকম নির্ভরযোগ্য নয়—হয়ত বা চোর ঢুকে পড়বে—এ উক্তি ছিল 'আবু আবারা' এবং অপর কিছু সংখ্যক হারেসাহ্ গোত্র-ভুক্তদের) অথচ তারা (তাদের ধারণানুযায়ী) অরক্ষিত নয় (অর্থাৎ তাদের চুরির ও অন্যান্য কোন বিপদাশংকা অবশ্যই ছিল না বা তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার পেছনে এরূপ উদ্দেশ্যও ছিল না যে, সন্তোষজনকভাবে ওখানকার যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর পর আবার রণক্ষেত্রে চলে আসবে।) এরা কেবল পালাতে চাচ্ছিল। আর (অথচ তাদের অবস্থা এই যে, তাদের নিজ নিজ বাড়িতে থাকাবস্থায়) যদি মদীনার চার দিক

থেকে তাদের মাঝে কেহ (কাফির সৈন্যদল) প্রবেশ করে, অতপর যদি তাদের নিকটে বিশৃংখলা সৃষ্টির (অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সমরে উপনীত হওয়ার) আবেদন করা হয় তবে এরা (সঙ্গে সঙ্গে) তা (ফাসাদ সৃষ্টির আবেদন) গ্রহণ করে নেবে ; এবং তাদের বাড়িতে খুব অল্পই অবস্থান করবে (অর্থাৎ কেবল এতটুকু সময়ের জন্য অবস্থান করবে যাতে কেউ আবেদন করতে পারে এবং এরা তা মঞ্জুর করে নিতে পারে ; এবং অনতিবিলম্বে প্রস্তুত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য গিয়ে উপস্থিত হবে এবং বাড়ির প্রতি কোন লক্ষ্যই করবে না যে, আমরা যদি অপরের বাড়িঘরে লুট-তরাজ করতে যাই তবে কেউ হয়তো আমাদের বাড়িও লুণ্ঠন করে নিতে পারে। তাই যদি এদের ইচ্ছা প্রকৃত প্রস্তাবেই বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে থাকে তবে এখন কেন বাড়িতে অবস্থান করে না। সুতরাং একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আসলে এদের মুসলমানদের প্রতি রয়েছে শত্রুতা আর কাফিরদের সাথে গোপন সম্প্রীতি। তাই, মুসলমানদেরকে সাহায্য করা এদের মোটেই কাম্য নয়। বাড়ি অরক্ষিত থাকার কথা নিতান্তই ভাওতা মাত্র।) অথচ এরা (ইতি) পূর্বে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল যে, (শত্রুর মুকাবিলায়) এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। (এ অঙ্গীকার সে সময় করেছিল যখন কতক লোক বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকায় কিছু সংখ্যক মুনাফিক কৃত্রিম দরদ ও সহানুভূতি প্রদর্শনার্থে বলতে লাগলো যে, আফসোস ! আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি, অন্যথায় এমন করতাম অমন করতাম। কিন্তু যখন সময় আসলো---সব গোমর ফাঁস হয়ে গেল।) আর আল্লাহ্‌র সাথে (এ ধরনের) যে সব অঙ্গীকার করা হয়, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আপনি (এদেরকে) বলে দিন যে, (তোমরা যে পালিয়ে ফিরছ---যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ---অর্থাৎ তারা কেবল পালিয়ে থাকতে চায়) তবে তোমাদের এরূপ পালানো কোন উপকারে আসবে না, যদি তোমরা এর মাধ্যমে মৃত্যু বা হত্যা থেকে পালাতে চাও। এর (পালানোর) ফলে সামান্য কয়েকদিন ব্যতীত (নির্ধারিত অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল) জীবনে আর অধিক লাভবান হতে পারবে না। (অর্থাৎ পালানোর ফলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে না। কেননা এর সময় নির্ধারিত। তা যখন নির্ধারিত তখন না পালালেও নির্ধারিত সময়ের আগে মৃত্যুবরণ করতে পারবে না। সুতরাং অবস্থান করলেও কোন ক্ষতি নেই ; আর পালালেও কোন লাভ নেই। সুতরাং পলায়ন করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বস্তুত এই তকদীরের মাস'আলা বিশ্লেষণ প্রসংগে তাদেরকে) আপনি বলে দিন যে, যদি আল্লাহ্ তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে চান তবে তোমাদেরকে তাঁর থেকে কে রক্ষা করতে পারবে (উদাহরণত যদি তোমাদেরকে তিনি ধ্বংস করতে চান তবে তোমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে সক্ষম হবে কি ?---যেমন তোমরা পালানোকে লাভজনক হবে বলে মনে কর।) অথবা সে কে যে তোমাদের উপর থেকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে রোধ করতে পারে যদি তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান ? (যথা, যদি

তিনি জীবন্ত রাখতে চান---যা পার্থিব অনুগ্রহের অন্তর্গত, তবে কেউ তাতে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারবে না---যেমন তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানকে তোমাদের জীবন হরণকারী ও আয়ু হ্রাসকারী বলে মনে হয়) এবং (তারা যেন স্মরণ রাখে যে,) আল্লাহ্ ভিন্ন নিজেদের কোন সাহায্যকারী পাবে না (যে তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারে) আর কোন সহায়কও পাবে না (যে তাদেরকে ক্ষতি ও দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে পারে। তকদীর সম্পর্কিত আলোচনার পর কপট বিশ্বাসীদের হীনতা ও নিন্দাবাদের বর্ণনাধারা পুনরারম্ভ হয়েছে। (অর্থাৎ) আল্লাহ্ পাক তোমাদের মধ্যকার সে সব লোকদের (ভালভাবেই) জানেন যারা (অপর লোকদের যুদ্ধে যোগদানের পথে) অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং যারা নিজ (দেশীয় বা বংশোদ্ভূত) ভাইদেরকে বলে যে, আমাদের নিকটে চলে এস (ওখানে নিজেদের প্রাণ দিতে যাচ্ছ কেন? একথা এক ব্যক্তি নিজের সহোদর ভাইকে গোশ্ত-রুটি খেতে খেতে বলছিল। মুসলমান ভাই আক্ষেপ করে বলতে লাগল, তুমি নিশ্চিন্তে বসে আছো অথচ নবীজী এমন দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছেন। সে বললো---মিয়া, তুমিও এখানে চলে আস) এবং (তাদের ভীরুতা, অর্থলোলুপতা ও কৃপণতার অবস্থা এরূপ যে) তারা যুদ্ধে খুব কমই যোগ-দান করে। (এ তো তাদের কাপুরুষতার দিক, আবার যদি যোগদান করেও, তবে) তোমাদের প্রতি কৃপণতা সহকারে (অর্থাৎ যোগদানের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমান-গণ সমস্ত গনীমতের মাল ভোগ করতে যেন সক্ষম না হয়, নামে মাত্র যুদ্ধে যোগদানের ফলে গনীমতের মালে অন্তত অংশীদারিত্বের দাবি তো করতে পারবে) সুতরাং (যখন তাদের কাপুরুষতা ও কৃপণতা উভয়টাই প্রমাণিত হলো, যার মোটা-মুটি প্রতিক্রিয়া এই যে,) যখন (কোন) আতঙ্ক ও ভীতিজনক (জায়গা বা) অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন আপনি তাদেরকে দেখতে পান যে, তারা আপনার প্রতি এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন মৃত্যু বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হয়ে তাদের চোখগুলো ঘুরছে (এ তো কাপুরুষ-তার ফলশ্রুতি) অতপর যখন সে আতঙ্ক দূরীভূত হয় তখন সম্পদের (গনীমত) লোভে তোমাদেরকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করতে থাকে (অর্থাৎ গনীমতের মাল পাওয়ার আশায় হৃদয় বিদীর্ণ করে দেয় এবং এমন কঠোর ভাষায় কথা বলতে থাকে যে, আমাদের অংশ কেন থাকবে না? আমাদের সহযোগিতায়ই তো তোমরা জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছ। এটা হলো কৃপণতা ও লোলুপতার পরিচয় ও লক্ষণ। এ তো হলো তোমাদের সাথে তাদের ব্যাপার। আর আল্লাহ্র সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এই যে,) এরা (প্রারম্ভিক অবস্থায়) ঈমান আনেনি বলে আল্লাহ্ পাক তাদের যাবতীয় পুণ্য (প্রথম দিকেই) বিকল করে দিয়েছেন (পরকালে কোন পুণ্যফল লাভ করবে না।) এবং একথা আল্লাহ্র পক্ষে একেবারে সহজসাধ্য (অর্থাৎ এ ব্যাপারে কেউ আল্লাহ্র বিরোধিতা করে একথা বলতে পারে না যে, আমরা এসব কৃত পুণ্যকর্মের প্রতিদান দেব। সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর সমাবেশকালেই তাদের অবস্থা ছিল এই। কিন্তু তাদের কাপুরুষতা এমন পর্যায়ে ছিল যে, সম্মিলিত শত্রুবাহিনী চলে যাওয়ার পরও) তাদের এরূপ ধারণা ছিল যে, (এখন পর্যন্ত) এসব সৈন্য ফিরে যায়নি। (এবং তাদের চরম কাপুরুষতার দরুন তাদের অবস্থা এই যে,) যদি (ধরে নেওয়া হয় যে,)

এই (প্রত্যাগমনকারী) সৈন্যদল (পুনরায় ফিরে) আসে (তবে) এরা (নিজেদের তরে) এ কামনাই করবে যে, কতইনা ভাল হতো যদি না আমরা শহরের বাইরে পল্লীগ্রামে (কোথাও) গিয়ে থাকতাম (এবং সেখানে বসে বসেই পথচারীদের নিকটে) তোমাদের খবরাখবর জিজ্ঞেস করতে থাকতাম (এবং এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ না দেখতে পেতাম)। আর যদি (ঘটনা চক্রে এদের সকলে বা কিছু সংখ্যক পল্লীতে যেতে সক্ষম নাও হয়) বরং তোমাদের মাঝেই থেকে যায়, তবুও (তিরস্কার-ভর্ৎসনা শোনেও তাদের লজ্জার উদ্রেক করবে না তবে নাম মাত্র) লড়াইতে যোগদান করতো। (পরবর্তী পর্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অনড় ও দৃঢ়পদ থাকাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুসরণ এবং ঈমানের স্বাভাবিক চাহিদা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মুনাফিকরা এই বলে লজ্জা-বোধ করে যে, তারা ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও এর স্বাভাবিক চাহিদা অনুশীলনের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে এবং অকপট ও অকৃত্রিম বিশ্বাসীগণকে এ সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, এরা নিঃসন্দেহে كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ .. الخ—এর শ্রেণীভুক্ত। তাই ইরশাদ হয়েছে যে,) তোমাদের জন্য (অর্থাৎ এমন সব লোকের জন্য) যারা আল্লাহ্ ও পরকাল সম্পর্কে ভয় পোষণ করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকির করে (অর্থাৎ পূর্ণ মু'মিন তাদের তরে) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাঝে এক উত্তম আদর্শ বিদ্যমান (আর যখন স্বয়ং তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন, তখন তার চাইতে অধিক প্রিয় এমন কে আছে যে, তাঁর (নবীজীর) অনুসরণ না করে দূরে অবস্থান করে নিজ প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরবে) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে মুনাফিকদের মুকাবিলায় খাঁটি মু'মিনগণের আলোচনা হচ্ছে) যখন মু'মিনগণ সৈন্যদল-সমূহকে দেখতে পেল তখন বলতে লাগলো যে, এটা তো সে (স্থান) যে সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (সা) (পূর্বেই) অবহিত করেছিলেন। (যেমন সূরা বাকারার এ আয়াতে এর প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে রয়েছে... ... أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

وَزُلْزِلُوا -الخ—কেননা সূরা-বাকারা, সূরা আহযাবের পূর্বে নাযিল হয়েছে—"ইতকানে" অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে।) এবং আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল (সা) সত্য বলেছেন এবং এ দ্বারা (সম্মিলিত সৈন্যদল দেখে----যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা সম্পূর্ণ সত্য বিধায়) তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আরো উন্নতি ঘটলো (এটা তো সমস্ত মু'মিনকুলের সাধারণ গুণ, আবার কিছু সংখ্যক মু'মিনের কতকগুলো বিশিষ্ট গুণাবলীও রয়েছে। সেগুলো এই যে,) এসব মু'মিনগণের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্র সাথে যেসব কথার অঙ্গীকার করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে (এরূপ শ্রেণীবিভাগের অর্থ এটা নয় যে, কতক মুসলমান অঙ্গীকার করে তা সত্যে পরিণত করেনি। বরং এ শ্রেণীবিভাগ এই ভিত্তিতে করা হয়েছে যে. কতক মু'মিন অঙ্গীকার না

করেও অনড় ও দৃঢ়পদ রয়েছে। আয়াতে وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّٰهَ الخ—উল্লিখিত কপট-বিশ্বাসীদের মুকাবিলায় এ আয়াতে এসব অঙ্গীকারকারীগণের বর্ণনা সুস্পষ্ট-ভাবে প্রদান করা হয়েছে এবং এসব অঙ্গীকারকারীগণের দ্বারা হযরত আনাস বিন নাযার ও তাঁর সঙ্গীগণকে বোঝানো হয়েছে। এসব মহৎ ব্যক্তিবর্গ ঘটনাক্রমে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম না হওয়ায় অনুতপ্ত হয়ে অঙ্গীকার করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে যদি আবার কোন জিহাদ সংঘটিত হয় তবে প্রাণপণ পরিশ্রম ও অসাধারণ ত্যাগের দৃশ্য পরিলক্ষিত হবে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না) আবার (এসব অঙ্গীকারকারীগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত) এদের মধ্যে কতক তো নিজেদের মানত পূরণ করেছেন (অর্থাৎ মানততুল্য অবশ্যপালনীয় অঙ্গীকার পূরণ করেছেন—শাহাদত বরণ করেছেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও পশ্চাদপসরণ করেন নি। তাই আনাস বিন নাযার (রা) ও হযরত মাস'আব (রা) যুদ্ধ করে করে শহীদ হয়ে যান।) আবার এদের মাঝে কতক (এ অঙ্গীকার পালনের সর্বশেষ লক্ষণ—অর্থাৎ শাহাদত বরণের) অভিলাষী (এখনও শাহাদত বরণ করেন নি) এবং (এখনো) এরা (এ ক্ষেত্রে) বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটায়নি (অর্থাৎ নিজ সংকল্পে অটল ও অনড়। সুতরাং সমগ্র জাতি দু'শ্রেণীতে বিভক্ত (১) মুনাফিক, কপট বিশ্বাসী যাদের বর্ণনা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে (২) মু'মিনগণ, আবার মু'মিনগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত—অঙ্গীকারাবদ্ধ ও অঙ্গীকার-বিহীন। দৃঢ়তা গুণ উভয় শ্রেণীতে বিদ্যমান যেরূপ কোরআনের আয়াত لَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الخ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়। অঙ্গীকারাবদ্ধগণ পুনরায় দু'ভাগে বিভক্ত, শাহাদত প্রাপ্ত—শাহাদতের তরে প্রতীক্ষারত। এ আয়াতসমূহ সর্বমোট চার শ্রেণীর বর্ণনা রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে এ যুদ্ধের এক নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যে,) এ ঘটনা এ কারণে সংঘটিত হয়েছিল, যেন আল্লাহ্ পাক খাঁটি বিশ্বাসীগণকে তাঁদের সত্যবাদিতার যথাযথ প্রতিদান প্রদান করেন এবং কপটবিশ্বাসীদেরকে চাই শাস্তি প্রদান করেন বা তাদেরকে (কপটতা থেকে) তওবা করার তওফীক প্রদান করেন। (কেননা এরূপ কঠিন সংকট ও দুর্যোগের মাঝে অকপট ও কপট উভয়ই একে অপর থেকে পৃথক হয়ে উঠে। আবার কখনো কখনো শাসনের দরুন কতক কৃত্রিম—কপট বিশ্বাসীও অকৃত্রিম নিষ্ঠাবানরূপে পরিণত হয়। আর কতক সে অবস্থাতে থেকে যায়।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক পরম ক্ষমাশীল ও মহান দয়াল। (তাই তওবা গৃহীত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এখানে তওবার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।) এবং (এ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানগণের অবস্থাসমূহের বর্ণনা ছিল। সামনে বিরুদ্ধবাদী কাফির-দের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে,) আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) ক্রোধপূর্ণ অবস্থায় (মদীনা থেকে) হটিয়ে দিয়েছেন। যেন তাদের কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি (এবং তারা ক্রোধে পরিপূর্ণ ছিল)। এবং সমর ক্ষেত্রে

মুসলমানগণের জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট ছিলেন (অর্থাৎ কাফিররা মূল যুদ্ধে উপনীত হওয়ার পূর্বেই প্রতিনিবৃত্ত হয়ে যায়। প্রণিধানযোগ্য যে, ছোট-খাটো বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ এর পরিপন্থী নয়।) আর (এরূপভাবে কাফিরদেরকে হটিয়ে দেওয়া বিস্ময়কর কিছু নয়। কেননা) আল্লাহ্ পাক—মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী। (তাঁর অসাধ্য কিছুই নয়। এ তো গেল মুশরিকদের অবস্থা। বিরোধী পক্ষের অপর দল ছিল কোরায়যা গোত্রভুক্ত ইহুদীগণ, যাদের বর্ণনা পরবর্তী পর্যায়ে আসছে।) যেসব আহ্লে কিতাব এই (মুশরিকদের) সহায়তা করেছিল তাদেরকে (আল্লাহ্ তা'আলা) তাদের দুর্গসমূহ হতে নিচে নামিয়ে দিলেন (যার মধ্যে তারা আবদ্ধ ছিল) এবং তাদের অন্তরে তোমাদের ভয় সঞ্চার করে দেন, (যদ্দরুন তারা নিচে নেমে আসে। অতঃপর) তোমরা কতককে তো হত্যা করতে লাগলে, আবার কতককে বন্দী করে নিলে। আর তোমাদেরকে তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধনসম্পদের অধিকারী করে দেওয়া হলো (এবং নিজের অনন্ত জ্ঞানে তোমাদেরকে) এমন সব ভূমিরও (মালিক করে দেওয়া হলো) যার উপর তোমরা (এখনো পর্যন্ত) পদার্পণও করনি (এখানে সাধারণভাবে ভবিষ্যত বিজয়সমূহের এবং বিশেষভাবে স্বল্পকাল পরই অর্জিতব্য খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে) আর আল্লাহ্ পাক যাবতীয় বস্তুর উপর পূর্ণভাবে ক্ষমতাবান (সুতরাং এসব কাজ তাঁর পক্ষে মোটেও অসাধ্য নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনন্য ও মহান মর্যাদার বর্ণনা এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ ও পদাঙ্ক অনুসরণের নির্দেশ ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আহ্যাবের (সম্মিলিত বাহিনী) যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কিত কোরআন পাকের এ দু'রুকূ অবতীর্ণ হয়েছে।—যাতে মুসলমানদের উপর কাফির ও মুশরিকদের সম্মিলিত আক্রমণ ও কঠিন পরিবেষ্টনের পর মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহ্র নানাবিধ অনুগ্রহ-রাজি এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিভিন্ন মু'জিযার বর্ণনা রয়েছে। আর আনুষঙ্গিকভাবে জীবনের বিভিন্ন দিক সংশ্লিষ্ট বহুবিধ হিদায়ত ও নির্দেশাবলী রয়েছে। এসব অমূল্য নির্দেশাবলীর দরুন বিশিষ্ট তফসীরকারকগণ আহযাবের ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করেছেন; বিশেষ করে কুরতুবী ও মাযহারী প্রমুখ তফসীরকার। তাই এখানে সে সব নির্দেশাবলী সমেত আহযাবের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হলো—যার অধিকাংশটুকু কুরতুবী ও মাযহারী থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যেটুকু অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে তারও যথাযথ উদ্ধৃতি প্রদত্ত হয়েছে।

আহযাবের যুদ্ধের বিবরণ ঃ حزب—احزاب-এর বহুবচন, যার অর্থ পার্টি বা দল। এ যুদ্ধে কাফিরদের বিভিন্ন দল ও গোত্র একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার সংকল্প নিয়ে মদীনার উপর চড়াও করেছিল বলে এর নাম আহযাবের (সম্মিলিত বাহিনীর) যুদ্ধ রাখা হয়েছে। যেহেতু এ যুদ্ধে শত্রুদের আগমন পথে নবীজী (সা)-র নির্দেশানুযায়ী পরিখা খনন করা হয়েছিল, এজন্য একে খন্দক (পরিখার)

যুদ্ধও বলা হয়। আর আহযাব যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যেহেতু বনূ কুরায়যার যুদ্ধও সংঘটিত হয়---উল্লিখিত আয়াতসমূহেও যার বর্ণনা রয়েছে; সুতরাং এ যুদ্ধও 'আহযাব' যুদ্ধেরই অংশ বিশেষ---যা বিস্তারিত ঘটনার মাধ্যমে জানা যাবে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) যে বছর মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তার পরের বছরই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তৃতীয় বছর হয় ওহুদের যুদ্ধ। আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয় চতুর্থ বছর। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে এটা পঞ্চম হিজরীর ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক, হিজরতের সূচনা থেকে এ যাবত মুসলমানদের উপর পর্যায়ক্রমে কাফিরদের আক্রমণ চলে আসছিল। আহযাবের যুদ্ধের আক্রমণ হয়েছিল দৃঢ় সংকল্প, অটুট মনোবল, অভূতপূর্ব শক্তি-পরাক্রম ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে। তাই হযরত (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে এ যুদ্ধ ছিল অপরাপর সকল যুদ্ধের চাইতে সর্বাধিক কঠিন ও সংকট সংকুল। কেননা এ যুদ্ধে আক্রমণকারী কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা পনের হাজারের মত ছিল বলে বলা হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মোট সংখ্যা মাত্র তিন হাজার---তাও আবার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রহীন---তদুপরি সময়টা ছিল কঠিন শীতের। কোরআনে করীম ঘটনার ভয়াবহতা এরূপভাবে বর্ণনা করেছে ঃ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ— (চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল) وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ— (হৃৎপিণ্ড--অর্থাৎ প্রাণ ছিল কণ্ঠাগত) وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا (এবং তারা কঠিন কম্পনে নিপতিত হয়)।

এ ঘটনা মুসলমানদের জন্য যেমন কঠিন ও সংকটময় ছিল, ঠিক তেমনই আল্লাহ্ পাকের অদৃশ্য সাহায্য-সহযোগিতার বদৌলতে মুসলমানগণের পক্ষে এর পরিণাম ফল এমন মহান বিজয় ও চরম সাফল্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে যে, বিপক্ষ মুশরিক ইহুদী ও কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেংগে চুরমার হয়ে যায়---এবং মুসলমানদের উপর ভবিষ্যতে আবার আক্রমণের দুঃসাহস দেখাতে পারে---তারা এমন যোগ্য আর রইল না। তাই এটা ছিল কুফর ও ইসলামের মধ্যকার একটা চূড়ান্ত ফয়সালার যুদ্ধ---যা চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরীতে মদীনার মূল ভূ-খণ্ডে সংঘটিত হয়েছিল।

ঘটনার সূচনা এরূপভাবে হয় যে, নবীজী (সা) ও মুসলমানগণের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণকারী বনূ নাযীর ও আবূ-ওয়ায়েল গোত্রভুক্ত বিশজন ইহুদী মক্কায় গিয়ে কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অনুপ্রাণিত করলো। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ মনে করত যে, যেরূপভাবে মুসলমানগণ আমাদের প্রতিমা পূজাকে

কুফরী বলে আখ্যায়িত করে, আমাদের ধর্মকে অপকৃষ্ট বলে ধারণা করে, আমাদের ধর্ম সম্পর্কে ইহুদীদের ধারণাও ঠিক একই রকম।---সুতরাং তাদের সহযোগিতা ও একাত্মতার আশা কিভাবে করা যেতে পারে। তাই তারা ইহুদীদেরকে প্রশ্ন করলো যে, মুহাম্মদ (সা) ও আমাদের মাঝে ধর্ম ব্যাপারে যে বিরোধ ও মতপার্থক্য রয়েছে তা আপনারা জানেন---আপনারা ঐশী গ্রন্থানুসারী প্রজ্ঞাবান লোক। সুতরাং একথা বলুন যে, আপনাদের দৃষ্টিতে আমাদের ধর্ম উত্তম না তাদের (মুসলমানের) ধর্ম।

রাজনীতিক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নতুন ব্যাপার নয়ঃ সেসব ইহুদীরা নিজেদের অন্তরস্থ জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তাদেরকে নিঃসংকোচে এ উত্তর দিয়ে দিল যে, তোমাদের ধর্ম মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মের চাইতে উত্তম। এ উত্তরে তারা খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করলো। এতদসত্ত্বেও ব্যাপার এ পর্যন্ত গড়াল যে, আগত এই বিশজন ইহুদী পঞ্চাশজন কুরায়শ নেতাসহ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ্‌র দেয়ালে নিজেদের বুক লাগিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে এ অঙ্গীকার করলো যে, এক ব্যক্তিও জীবিত থাকা পর্যন্ত তারা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

আল্লাহ্‌র ধৈর্য ঃ আল্লাহ্‌র ঘরে---সে ঘরেরই দেয়ালে বুক লাগিয়ে আল্লাহ্‌র শত্রুরা তদীয় রসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গীকার ও সংকল্প গ্রহণ করছে---এবং যুদ্ধের নতুন প্রেরণা নিয়ে পূর্ণ তৃপ্তিসহ নিশ্চিন্তে ফিরে আসছে। এটা ছিল আল্লাহ্‌র ধৈর্য ও অনুগ্রহের বিস্ময়কর প্রকাশ। কাহিনীর শেষভাগে তাদের এ অঙ্গীকারের করুণ পরিণতি সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যাবে যে, এ যুদ্ধে তারা সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যায়।

এই ইহুদীরা মক্কার কুরায়শদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আরবের এক খ্যাতনামা সমরকুশলী গোত্র বনূ গাতফানের নিকটে পৌঁছে তাদেরকে বলল যে, আমরা মক্কার কুরায়শদের সাথে এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যে, নতুন ধর্ম ইসলামের বাহক ও সম্প্রসারকদেরকে এক যৌথ আক্রমণের মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করে দেব। আপনারাও এ বিষয়ে আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হোন। সাথে সাথে ঘুষ হিসাবে এ প্রস্তাবও পেশ করল যে, এক বছরে খায়বারে যে পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হবে তার সম্পূর্ণটুকু, কোন কোন বর্ণনামতে তার অর্ধেক, বনূ গাতফানকে প্রদান করা হবে। গাতফান গোত্র প্রধান উয়াইনা বিন হাসান উপরোক্ত শর্তে তাদের সাথে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যথারীতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

পারস্পরিক চুক্তিপত্র মুতাবিক আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামসহ তিন'শ ঘোড়া ও এক হাজার উট সমেত চার হাজার কুরায়শ সৈন্য মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে মাররে যাহরান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। এখানে বনূ আসলাম, বনূ আশজা, বনূ মুররাহ, বনূ কেনানাহ, বনূ ফাযারাহ, বনূ গাতফান প্রমুখ গোত্রের লোক এদের সাথে মিলিত হয়। যাদের মোট সংখ্যা কোন সূত্রানুযায়ী দশ হাজার, কোন সূত্রানুযায়ী বার হাজার, আবার কোন সূত্রানুযায়ী পনের হাজার বর্ণনা করা হয়েছে।

মদীনার উপর বৃহত্তর আক্রমণ ঃ বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের বিপক্ষীয় কাফির সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আবার ওহুদের যুদ্ধে আক্রমণকারী সৈন্য ছিল তিন হাজার। এবার সৈন্য সংখ্যাও পূর্ববর্তী প্রত্যেক বারের চাইতে অনেক বেশি। সাজ-সরঞ্জামও প্রচুর---আর এটা সমগ্র আরব ও ইহুদী গোত্রের সম্মিলিত শক্তি।

মুসলমানগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি---(১) আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা (২) পারস্পরিক পরামর্শ----(৩) সাধ্যানুসারে বাহ্যিক বস্তুগত বাহন ও উপকরণ সংগ্রহ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) এ সম্মিলিত বাহিনীর সংবাদ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মুখনিঃসৃত সর্ব প্রথম বাক্যটি ছিল---حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের সর্বোত্তম নিয়ামক।) অতপর মুহাজির ও আনসারদের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্র করে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। যদিও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অপরের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই---তিনি সরাসরি বিধাতার ইংগিত ও অনুমতিসাপেক্ষে কাজ করেন; কিন্তু পরামর্শে দু'ধরনের লাভ রয়েছে; (১) উম্মতের মাঝে পরামর্শের রীতি চালু করা, (২) মু'মিনগণের অন্তকরণে পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির উন্মেষ সাধন এবং পরস্পরের মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার প্রেরণা পুনর্জাগরণ।উপরন্তু যুদ্ধ ও দেশরক্ষা সংক্রান্ত বাহ্যিক উপকরণ সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। পরামর্শ সভায় হযরত সালমান ফারসী (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। ---যিনি সদ্য জনৈক ইহুদীর দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করে ইসলামের খিদমতের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, এরূপ পরিস্থিতিতে পারসিকদের রণকৌশল হচ্ছে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরিখা খনন করে তাদের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে এ কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

পরিখা খনন ঃ শত্রুদের মদীনার সম্ভাব্য প্রবেশদ্বার 'সালা' পর্বতের পশ্চাৎবর্তী পথের সমান্তরালে এ পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিখার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের নক্সা নবীজী স্বয়ং অংকন করেন। এই পরিখা 'শায়খাইন' নামক স্থান হতে আরম্ভ করে 'সালা' পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা 'বাতহান' উপত্যকা ও 'রাতুনা' উপত্যকার সংযোগস্থল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই পরিখার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় সাড়ে তিন মাইল। এর প্রশস্ততা ও গভীরতার সঠিক পরিমাণ কোন রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায় না। তবে একথা পরিষ্কার যে, এতটুকু গভীর ও প্রশস্ত অবশ্যই ছিল, যাতে শত্রুসৈন্য তা সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম না হয়। হযরত সাল্‌মান (রা)-এর পরিখা খনন প্রসংগে বলা হয় যে, তিনি প্রত্যহ পাঁচ গজ দীর্ঘ ও পাঁচ গজ গভীর---এ পরিমাণ পরিখা খনন করতেন।---(মাযহারী) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিখার গভীরতা পাঁচগজ পরিমাণ ছিল।

মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ঃ এ যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যাছিল সর্বমোট তিন হাজার এবং ঘোড়া ছিল সর্বমোট ৩৬ টি।

পূর্ণ বয়স্কতা লাভের জন্য পনর বছর নির্দিষ্ট হয়ঃ মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কিছুসংখ্যক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকও ঈমানী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ্ (সা) পনর বছরের চাইতে কম বয়স্ক বালকগণকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর, যায়েদ বিন সাবেত, আবূ সাঈদ খুদরী, 'বারা বিন আযিব প্রমুখ এঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলিম বাহিনী যখন মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন যে সব মুনাফিক মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থাকতো, তারা গড়িমসি করতে লাগলো। কিছুসংখ্যক তো অজ্ঞাতসারে চুপে চুপে বের হয়ে গেল। আবার কিছু সংখ্যক মিথ্যা ওযর পেশ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকটে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগলো। উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে এ সব মুনাফিকের প্রসংগে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে।---(কুরতুবী)

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা বিধানের উদ্দেশ্যে বংশ ও গোত্রগত শ্রেণীবিভাগ ইসলামী ঐক্য ও জাতিত্বের পরিপন্থী নয়ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) এই যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকা হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা)-কে এবং আনসারের পতাকা হযরত সা'আদ বিন ওবাদাহ্ (রা)-কে প্রদান করেন। এ সময়---মুহাজির ও আনসারের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় ও সুদৃঢ় ছিল এবং সকলে পরস্পর ভাই-ভাই ছিলেন। কিন্তু শৃংখলা বিধান ও ব্যবস্থাগত সুবিধার জন্য মুহাজির ও আনসারদের নেতৃত্ব পৃথক করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, ব্যবস্থাপনাগত সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ইসলামী ঐক্য ও জাতিত্বের পরিপন্থী নয়; বরং প্রত্যেক দলের উপর দায়িত্বভার পৃথকভাবে অর্পিত হলে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সহযোগিতাবোধ সুদৃঢ় হয়। এ যুদ্ধের সর্বপ্রথম কাজ---পরিখা খননের ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাবোধ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

পরিখা খননের দায়িত্বভার বণ্টনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাজির ও আনসার সমন্বয়ে গঠিত সমগ্র সৈন্যকে দশ দশ ব্যক্তি সম্বলিত দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের উপর চল্লিশ গজ পরিমাণ পরিখা খননের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত সালমান ফারসী (রা) যেহেতু পরিখা খনন পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও এ কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন এবং তিনি মুহাজির ও আনসার কারো অন্তর্গত ছিলেন না, তাই তাঁকে নিজ নিজ দলভুক্ত করার জন্য মুহাজির ও আনসারদের মাঝে কিছুটা প্রতিযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় নবীজী (সা) এই মীমাংসা করলেনঃ سلمان منا اهل البيت অর্থাৎ সালমান আমার পরিবারভুক্ত।

যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে স্বদেশী ও বিদেশী, স্থানীয় ও বহিরাগত বৈষম্যঃ অধুনা বিশ্বে মানুষ পরদেশী বহিরাগত অধিবাসীগণকে সমমর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক দল যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ নিজ দলভুক্ত করা গৌরবজনক বলে মনে করতো। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) সালমানকে নিজ পরিবারভুক্ত করে বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসার অন্তর্ভুক্ত করে দশজনের

পৃথক দল গঠন করেন। হযরত আমর বিন আউফ (রা), হযরত হুযায়ফা (রা) প্রমুখ মুহাজির এ সম্মিলিত দলের অন্তর্গত ছিলেন।

একটি বিশেষ মু'জিযা ঃ পরিখার যে অংশ হযরত সালমান (রা) প্রমুখের উপর ন্যস্ত ছিল, ঘটনাক্রমে সেখানে এক সুকঠিন, মসৃণ ও সুবিস্তৃত প্রস্তরখণ্ড পরিলক্ষিত হয়। হযরত সালমান (রা)-এর সহকারী হযরত আমর বিন আউফ (রা) বলেন যে, এ প্রস্তরখণ্ড আমাদের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিকল করে দেয় এবং আমরা এটা কাটতে অক্ষম হয়ে পড়ি। অতপর আমি সালমান (রা)-কে বলি যে, এখানে খানিকটা বাঁকা করে খনন করে মূল পরিখার সাথে মিলিয়ে দেওয়া অবশ্য সম্ভব। কিন্তু আমাদের নিজস্ব মতে রসূলুল্লাহ্ (সা) অংকিত রেখা পরিত্যাগ করে অন্যত্র পরিখা খনন করা বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং আপনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে পরামর্শ করুন যে, এখন আমাদের কর্তব্য কি হবে।

বিধাতার সতর্ক সংকেত ঃ এই সুদীর্ঘ তিন মাইল পরিখা খনন করতে গিয়ে কোন খননকারীই কোন দুর্জয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন নি, কিন্তু সম্মুখীন হলেন পরিখার পরামর্শদাতা হযরত সালমান (রা) স্বয়ং। আল্লাহ্ পাক এ কথা প্রমাণ করে দিলেন যে, পরিখা খননের ক্ষেত্রেও তাঁর সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই, যাবতীয় যন্ত্রপাতি ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এতে এ শিক্ষাই নিহিত রয়েছে যে, সাধ্যানুসারে বাহ্যিক ও বস্তুগত মাধ্যম ও উপকরণ সংগ্রহ করা অবশ্য ফরয---কিন্তু এগুলোর উপর নির্ভর করা বৈধ নয়। যাবতীয় বস্তুগত উপকরণ ও বাহন সংগৃহীত হওয়ার পরও মু'মিনের কেবল আল্লাহ্ তা'আলার উপরই নির্ভর করা উচিত।

হযরত সালমান (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং নিজ অংশের খননকার্যে লিপ্ত থেকে সেখান থেকে পরিখার মাটি স্থানান্তরিত করছিলেন। হযরত বারা বিন আযিব (রা) বলেন, আমি দেখলাম যে, নবীজী (সা)-র শরীর ধূলো-বালিতে এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, তাঁর পেট ও পিঠের চামড়া পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না, এমতাবস্থায় সালমানকে কোন পরামর্শ বা নির্দেশনা দিয়ে নবীজী (সা) স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং পরিখায় অবতরণ করে সালমান (রা)-এর নেতৃত্বে খননকার্যে লিপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান এবং নিজ হাতে কোদাল ধারণ করে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন আর এ আয়াত পাঠ করেন تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا (অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ সত্য সত্যই পূর্ণ হয়েছে) প্রথম আঘাতেই পাথরের এক-তৃতীয়াংশ কেটে যায়। সাথে সাথে প্রস্তরখণ্ড থেকে এক আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। অতপর তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত হেনে উল্লিখিত আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا – দ্বিতীয়বারের আয়াতে আরো এক-তৃতীয়াংশ কেটে যায় ও পূর্বের ন্যায় আবার আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। তৃতীয়বার সেই পুরো আয়াত

পাঠ করে তৃতীয় আঘাত হানেন। এ আঘাতে অবশিষ্টাংশ কেটে যায়। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখা থেকে উঠে আসেন এবং পরিখার পার্শ্বে রক্ষিত চাদর তুলে নিয়ে এক পাশে বসে পড়েন। সে সময়ে হযরত সালমান (রা) আরয করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা), আপনি পাথরের উপর যতবার আঘাত করেছিলেন ততবার সে পাথর থেকে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সালমানকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি কি তুমি এমন রশ্মি দেখেছ? তিনি আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি।

রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন, প্রথম আঘাতে নিঃসৃত আলোকচ্ছটায় ইয়ামান ও কিসরার (পারস্য) বিভিন্ন নগরের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাই এবং হযরত জিবরাঈল আমীন আমাকে বললেন যে, আপনার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব শহর জয় করবে, আর দ্বিতীয় আঘাতে নিঃসৃত আলোকরশ্মির সাহায্যে আমাকে রোমের লোহিত বর্ণের প্রাসাদসমূহ প্রদর্শন করানো হয় এবং জিবরাঈল (আ) এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, আপনার উম্মতগণ এসব শহরও অধিকার করবে। নবীজী (সা)-র এই ইরশাদ শুনে মুসলমানগণ স্বস্তি লাভ করলেন এবং ভবিষ্যতের সুমহান বিজয় ধারা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপিত হলো।

মুনাফিকদের কটাক্ষপাত ঃ সে সময়ে যেসব মুনাফিক পরিখা খনন কাজে অংশ নিয়েছিল, তারা বলতে লাগল, তোমাদের কি মুহাম্মদ (সা)-এর কথায় বিস্ময়ের উদ্রেক করে না? তিনি তোমাদেরকে কিরূপ অবাস্তব ও অমূলক (ভবিষ্যদ্বাণী শোনাচ্ছেন) যে, মদীনার পরিখা গহবরে তিনি হীরা, মাদায়েন ও পারস্যের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাচ্ছেন। আবার তোমরা নাকি সেগুলো অধিকার করবে! নিজেদের অবস্থার প্রতি একটু তাকাও।—তোমাদের নিজ শরীরের খবর লওয়ার মত হুঁশজ্ঞান নেই—পায়খানা প্রস্রাব করার মত সময়টুকু পর্যন্ত নেই। অথচ রোম-পারস্য প্রভৃতি দেশ নাকি অধিকার করবে। এসব কটাক্ষপাতের পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ নাযিল হয় ঃ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا অর্থাৎ যখন কপট বিশ্বাসী ও ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা বলতে লাগল যে, আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (সা) প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এ আয়াতে الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ বাক্যে সে সব কপট বিশ্বাসীদের অবস্থা বিবৃত হয়েছে যাদের অন্তর কপটতা ব্যাধিতে আচ্ছন্ন।

ভেবে দেখুন যে, মুসলমানগণের ঈমান এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভবিষ্যদ্বাণীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা ছিল। সর্বদিক থেকে কাফিরদের দ্বারা

পরিবেষ্টিত এবং চরম বিপদ ও দুর্যোগের মুখোমুখি---পরিখা খননের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক নেই, হাড়-কাঁপানো প্রচণ্ড শীতের মাঝে আয়াস সাপেক্ষ পরিখা খননের এরূপ কঠিন দায়িত্ব নিজেদের মাথায়ই তুলে নিয়েছেন। সকল দিক থেকে ভয়ভীতি বাহ্যিক উপকরণ ও অবস্থা দৃষ্টে নিজেদের টিকে থাকা ও নিছক অস্তিত্বটুকু বজায় রাখা সম্পর্কে আস্থাবান থাকাই কঠিন। এমতাবস্থায় তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি---বৃহত্তম সাম্রাজ্য রোম ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ ও আগাম বার্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকারে সম্ভব ? কিন্তু সমস্ত আমল থেকে ঈমানের মূল্য অধিক হওয়ার কারণ এই যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি---বাহ্যিক বাহন ও উপকরণসমূহ সম্পূর্ণ পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও রসূল (সা)-এর ইরশাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা শংকা দ্বিধার উদ্রেক করে না।

উল্লিখিত ঘটনাতে উম্মতের জন্য বিশেষ নির্দেশ ঃ একথা কারো অজানা নয় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবীজীর কেমন উৎসর্গিত প্রাণ সেবক ছিলেন।---তাঁরা কখনো এটা কামনা করতেন না যে, মজুরের এই কঠিন ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও অংশগ্রহণ করুন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের মনের সান্ত্বনা ও পরিতৃপ্তি এবং উম্মতের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই পরিশ্রমে সমভাবে অংশ নেন। নবীজী (সা)-র জন্য তাঁর সাহাবায়ে কিরামের উৎসর্গ এবং ত্যাগ তাঁর অনন্য ও অনুপম গুণাবলী এবং নবুয়ত ও রিসালতের ভিত্তিতে তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু দৃশ্যমান কারণসমূহের মাঝে বৃহত্তম কারণ এটাই ছিল যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রতিটি কায়-ক্লেশ, অভাব-অনটন ও দুঃখকষ্টে পুরোপুরি শরীক থাকতেন,---শাসক-শাসিত, রাজা-প্রজা, নেতা-অনুসারী জনিত বৈষম্য ও পার্থক্যের কোন ধারণাও সেখানে ছিল না। আর যখন থেকে মুসলিম শাসকমণ্ডলী এ নীতি বর্জন করেছে তখন থেকে এ বিভেদ ও বিচ্ছেদের উন্মেষ ঘটেছে।---নানাবিধ অশান্তি---উচ্ছৃংখলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

যাবতীয় বিপদাপদ উত্তীর্ণ হওয়ার অমোঘ বিধান ঃ উল্লিখিত ঘটনায় নবীজী এই দুর্জেয় প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত হানার সাথে সাথে কোরআনের আয়াত---

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ط لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ

পাঠ করেন।

সুতরাং বোঝা গেল যে, এ আয়াত যে কোন কঠিন সমস্যা ও বিপদ থেকে উদ্ধারের এক অমোঘ ব্যবস্থাপত্র---অব্যর্থ বিধান।

সাহাবায়ে কিরামের অনন্য ত্যাগ ঃ উপরে জানা গেছে যে, প্রত্যেক দশ গজ পরিমাণ খননের জন্য দশজন করে লোক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, কতক লোক অধিক দক্ষ ও সবল এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁদের খনন কার্যের নির্ধারিত অংশ সম্পন্ন হয়ে যেত তাঁরা তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে ভেবে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতেন না ; বরং যাঁদের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেন।---(কুরতুবী, মাযহারী)

দীর্ঘ পরিখা ছ'দিনে সমাপ্ত হয়ঃ সাহাবায়ে কিরামের শ্রম সাধনার ফলাফল ছ'দিনেই প্রকাশিত হলো---এই সুদীর্ঘ, প্রশস্ত---গভীর পরিখা ছ'দিনেই সম্পন্ন হয়ে গেল।---(মাযহারী)

হযরত জাবির (রা)-এর দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত এক চাক্ষুষ মু'জিযাঃ এই পরিখা খননকালে সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়। একদিন হযরত জাবির (রা) নবীজী (সা)-কে ক্ষুধায় কাতর বলে উপলব্ধি করে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললেন যে, রান্না করার মত কিছু থাকলে তা রান্না কর। স্ত্রী বললেন যে, বাড়িতে এক সা' (সাড়ে তিন সের) পরিমাণ যব আছে---তা পিষে নেই। স্ত্রী আটা তৈরি করে পাকাতে লেগে গেলেন! বাড়িতে একটি ছাগল ছানা ছিল, হযরত জাবির (রা) তা জবাই করে তৈরি করে ফেললেন। অতপর মহানবী হযরত (সা)-কে ডেকে আনতে রওয়ানা হলেন। স্ত্রী ডেকে বললেন যে, নবীজীর সাথে তো সাহাবায়ে কিরামের এক বিশাল জমাত রয়েছে। তাই কেবল নবীজী (সা)-কে চুপে-চুপে একা ডেকে আনবেন। সাহাবায়ে কিরামের এই বিশাল জমাত এলে কিন্তু লজ্জিত হতে হবে। হযরত জাবির (রা) নবীজী (সা)-র নিকট প্রকৃত অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললেন যে, কেবল এ পরিমাণ খাবার রয়েছে। কিন্তু নবীজী (সা) সাহাবায়ে কিরামের বিশাল জমাতকে সম্বোধন করে বললেন জাবির (রা)-এর বাড়িতে দাওয়াত----সবাই চলো। হযরত জাবির (রা) বিব্রত হয়ে পড়লেন। বাড়ি পৌঁছে স্ত্রীকে অবহিত করায় তিনি চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, নবীজী (সা)-কে খাবারের পরিমাণ জ্ঞাত করেছেন কিনা? হযরত জাবির (রা) বললেন যে, হ্যাঁ, তা করেছি। মহীয়সী স্ত্রী তখন নিশ্চিত হয়ে বললেন যে, তবে আর উদ্বেগের কারণ নেই।---নবীজী (সা) স্বয়ংই এখন মালিক; যেমনি খুশি তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বহস্তে রুটি ও তরকারি পরিবেশন করেন---এবং জমাতভুক্ত প্রত্যেকে পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পেট পুরে খান। হযরত জাবির (রা) বলেন যে, এই বিশাল জমাত খাওয়ার পরও হাঁড়ির গোশত বিন্দুমাত্র হ্রাস পেল না এবং মথিত আটা অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। আমরা পরিবারের সকল সদস্যও পেট পুরে খেয়ে অবশিষ্টাংশ প্রতিবেশিগণের মাঝে বন্টন করে দিলাম।

এরূপভাবে ছ'দিনে পরিখার খননকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর শত্রুসৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী এসে পড়ল, রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) সালা' (سلع) পর্বত নিজেদের পশ্চাতে ফেলে সৈন্যগণকে সারিবদ্ধ করেন।

কুরায়যা গোত্রের ইহুদীদের চুক্তি লংঘন ও সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষাবলম্বনঃ এ সময়ে দশ-বার হাজারের সম্পূর্ণ সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সাজ-সরঞ্জামহীন নিরস্ত্র তিন হাজার লোকের মুকাবিলা যুক্তি-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে। তদুপরি আবার নতুন কিছুর সংযোজন হলো। সম্মিলিত বাহিনীভুক্ত বনূ নযীর গোত্রপতি হুইয়াই বিন

আখতাব---যে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল---মদীনা পৌঁছে ইহুদী গোত্র বনূ কুরায়যাকেও নিজেদের দলভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বনূ কুরায়যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ ছিল বলে একে অপর সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্ন ছিল। বনূ কুরায়যার নেতা ছিল কা'ব বিন আসাদ। হুইয়াই বিন আখতাব তার উদ্দেশে রওয়ানা করলো। এ সংবাদ পেয়ে কা'ব তার দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিল---যাতে হুইয়াই সে পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। কিন্তু হুইয়াই দরজা খোলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কা'আব দুর্গের ভেতর থেকেই উত্তর দিল যে, আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে মৈত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ এবং এ যাবত তারা চুক্তির শর্তাবলী পুরোপুরি পালন করে আসছে। ---চুক্তির পরিপন্থী কোন আচরণই পরিলক্ষিত হয়নি, সুতরাং আমরা এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ বলে আপনাদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারছি না। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হুইয়াই বিন আখতাব দরজা খোলার এবং কা'বের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো এবং সে ভেতর থেকে অস্বীকৃতি জানাতে লাগল, কিন্তু কা'বকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দেওয়ায় অবশেষে সে দরজা খুলে হুইয়াইকে ভেতরে ডেকে নিল, হুইয়াইর মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে অবশেষে কা'ব তার ফাঁদে পড়ে গেল ও সম্মিলিত বাহিনীর সাথে অংশ গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার করল। কিন্তু কা'ব যখন গোত্রের অন্য নেতৃবৃন্দের নিকটে একথা প্রকাশ করলো তারা সমস্বরে বলে উঠলো যে, অকারণে মুসলমানদের সহিত চুক্তিভংগ করে মারাত্মক ভুল করেছ। কা'বও তাদের কথায় নিজের ভুল অনুধাবন করে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করল। কিন্তু পরিস্থিতি তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। অবশেষে এ চুক্তি লংঘনই বনূ কোরায়যার ধ্বংস ও পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়---যার বিবরণ পরে আসছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এই সংকটময় মুহূর্তে বনূ নাযীরের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হন। সম্মিলিত বাহিনীর আগমন পথে পরিখা খননের মাধ্যমে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু এ গোত্র মদীনার অভ্যন্তরেই অবস্থান করছে বলে এদের থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি---তা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত হয়ে উঠলেন। কোরআন করীমে 'কাফিরদের সম্মিলিত সৈন্য তোমাদের উপর চড়াও করে ফেলে, এ বাক্য সম্পর্কে যে বলা হয়েছে مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ এর ব্যাখা প্রসংগে কোন কোন বিশিষ্ট তফসীরকার এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন যে, فَوْق---উপর দিক থেকে আগমনকারী দ্বারা বনূ কুরায়যাকে এবং أَسْفَل নিম্নদিক থেকে আগমনকারী দ্বারা সম্মিলিত বাহিনীর অবশিষ্টাংশকে বোঝানো হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিভঙ্গের মূল তত্ত্ব ও সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে আনসারের 'আউস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন মায়াযকে এবং খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন ওবাদাহ্কে কা'বের সাথে আলোচনার জন্য প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে দেন যে, চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা যদি অসত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে তা সকল সাহাবায়ে-কিরামের সামনে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেবে ; আর যদি সত্য হয় তবে আকার ইঙ্গিতেবলবে যাতে আমরা বুঝে নিতে পারি, যাতে সাধারণ সাহাবীগণের মাঝে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার উদ্রেক না করে। এই মহান ব্যক্তিদ্বয় ওখানে পৌঁছে চুক্তিভঙ্গের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পান। তাদের ও কা'বের মাঝে বাদানুবাদ ও কড়া কথাবার্তাও হয়। ফিরে এসে পূর্বনির্দেশমত আকার-ইঙ্গিতে চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা সঠিক বলে হুযূর (সা)-কে অবহিত করেন।

এ সময় মুসলমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ—ইহুদী গোত্র বনূ কুরায়যা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে তখন যারা কপটতাসহ মুসলমানদের সাথে অবস্থান করছিল, তাদের কপটতা প্রকাশ পেতে লাগলো। কেউ কেউ তো খোলাখুলিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলো, যেমন উপরে বলা হয়েছে إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ—আবার কতক মিথ্যা অমূলক অজুহাত তুলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার উদ্দেশ্যে নবীজী (সা)-র নিকটে অনুমতি চাইতে লাগলো। যার বর্ণনা উল্লিখিত আয়াতে إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ الخ বাক্যে রয়েছে।

এখন যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা ছিল এই যে, পরিখার দরুন আক্রমণকারী সম্মিলিত বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। এর অপর প্রান্তে মুসলিম সৈন্য অবস্থান করছিল। সর্বক্ষণ উভয়ের মাঝে তীর নিক্ষেপ অব্যাহত ছিল। এ অবস্থায়ই প্রায় একমাস কেটে যায়—খোলাখুলি ভাগ্য নির্ধারিত কোন যুদ্ধও হচ্ছিল না—আবার কখনো নিশ্চিন্তে শংকামুক্ত থাকাও যাচ্ছিল না। দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণ রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম পরিখা প্রান্তে অবস্থান করে এর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিয়োজিত থাকছেন যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ংও এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টে শরীক ছিলেন, কিন্তু সমগ্র সাহাবায়ে কিরামের চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মাঝে কালাতিপাত নবীজীর পক্ষে সবিশেষ পীড়াদায়ক ছিল।

রসূলুল্লাহ্র একটি যুদ্ধ কৌশল ঃ হুযূর (সা) এ কথা জানতে পেরেছিলেন যে, গাতফান গোত্রপতি খায়বারের ফলমূল ও খেজুরের লোভে এসব ইহুদীর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তিনি বনূ গাতফানের অপর দুটি গোত্রপতি উয়াইনা বিন হাসান ও আবুল হারিস বিন আমরের নিকটে দূত মারফত প্রস্তাব পাঠালেন যে, তোমরা যদি স্বীয় সহচরবৃন্দসহ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাও তবে তোমাদেরকে মদীনায় উৎপন্ন ফলের

এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে কথাবার্তা চলছিল। এ প্রস্তাবে উভয় নেতা সম্মতিও প্রদান করেছিল---চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় হয় ভাব। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অভ্যাস মুতাবিক এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের দুই বরেণ্য নেতা---হযরত সা'দ বিন মায়ায ও সা'দ বিন ওবাদাহ্কে ডেকে তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন।

হযরত সা'দ (রা)-এর ঈমানী জোশ ঃ উভয় নেতাই আরয করলেন যে, হুযূর, আপনি যদি এ কাজ করতে আল্লাহ্ পাক কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমাদের কিছু বলার নেই---তা মেনে নেব। অন্যথায় বলুন এটা কি আপনার স্বাভাবিক মত না আমাদেরকে পরিশ্রম ও কায়ক্লেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এরূপ চিন্তা করছেন ?

রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন যে, এটা বিধাতার নির্দেশও নয় বা আমার ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ইচ্ছাও এরূপ নয় বরং তোমাদের দুঃখকষ্টের কথা বিবেচনা করে এ পথে অগ্রসর হচ্ছি। কেননা তোমরা সকল দিক থেকে পরিবেষ্টিত। আমি এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে বিপক্ষদলের শক্তি ভেংগে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছি। হযরত সা'দ (রা) আরয করলেন---হে আল্লাহ্র রসূল!---আমরা যে সময়ে প্রতিমা পূজারী ছিলাম---মহান আল্লাহ্কে চিনতাম না---তাঁর উপাসনা আরাধনাও করতাম না---সে সময়েও এ নগরের এসব লোক এ শহরের কোন ফলের একটি দানা পর্যন্ত লাভের আশা প্রকাশ করতে সাহস পেত না। অবশ্য যদি না তারা আমাদের মেহমান হয়ে আসত এবং মেহমান হিসাবে তাদেরকে খাইয়ে দিতাম---অথবা খরিদ করে নিত। আজ যখন আল্লাহ্ পাক মেহেরবানীপূর্বক তাঁর পরিচয় প্রদান করে ধন্য করেছেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সম্মানে ভূষিত করেছেন, তবে এখন কি আমরা তাদেরকে আমাদের ফল-মূল ও ধনসম্পদ চুক্তির মাধ্যমে দিয়ে দেব! তাদের সাথে আমাদের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা তাদেরকে তরবারির আঘাত ব্যতীত অন্য কিছুই দেব না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা না করে দেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সা'দের সুদৃঢ় মনোবল ও ঈমানী মর্যাদাবোধ দেখে নিজের মত পরিত্যাগ করে ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ইচ্ছা---যা চাও তাই করতে পার। হযরত সা'দ (রা) তাদের নিকট থেকে সুলেহনামার কাগজপত্র নিয়ে উহার লেখা মুছে বিলীন করে দেন। কেননা এ পর্যন্ত তা স্বাক্ষরিত হয়নি। গাতফান গোত্র-পতি হারিস ও উয়াইনা---যারা সন্ধির জন্য প্রস্তুত হয়ে মজলিসে এসেছিল, সাহাবায়ে কিরামের শৌর্যবীর্য ও সুদৃঢ় মনোবল দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং মনে মনে দোদুল্যমান হয়ে পড়লো।

আহত হওয়ার পর হযরত সা'দ বিন মা'আযের দোয়া ঃ এদিকে পরিখার উভয় দিক থেকে পাথর ও তীর নিক্ষেপের ধারা অবিরাম চলছিল। হযরত সা'দ বিন মা'আয মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত বনী হারেসার ছাউনিতে তাঁর মায়ের নিকটে যান।

হযরত আয়েশা (রা) ফরমান যে, আমিও সে সময় এ ছাউনিতে ছিলাম। তখন পর্যন্ত নারীদের জন্য পর্দা করার আয়াত নাযিল হয়নি। আমি হযরত সা'দকে একটি ছোট বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলাম---যার মধ্য থেকে তাঁর হাত বের হয়ে পড়ছিল এবং তার মা তাকে বলেছিলেন যে, অতিসত্বর রসূলুল্লাহ (সা)-র পাশে চলে যাও। আমি তাঁর মাকে বললাম যে, বর্মটা আরও কিছুটা বড় হলে ভাল হতো। তাঁর বর্ম বহির্ভূত হাত-পা আহত ও ক্ষত হওয়ার আশংকা আছে। মা বললেন, কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ্ যা করতে চান তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

হযরত সা'দ বিন মা'আয (রা) সৈন্যদের মাঝে প্রবেশ করার পর তীরবিদ্ধ হন। তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ রগ কেটে যায়। অতপর সা'দ (রা) এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! ভবিষ্যতে রসূলুল্লাহ (সা)-র বিরুদ্ধে যদি কুরায়শদের আরো কোন আক্রমণ নির্ধারিত থেকে থাকে, তবে তার জন্য আমাকে জীবন্ত রাখুন। কেননা এটাই আমার একান্ত কামনা যে, আমি সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা নবীজীর প্রতি নানাভাবে নির্যাতন করেছে---মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে---এবং তাঁর আদর্শকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। আর যদি আপনার জানা মতে এ যুদ্ধের ধারা সমাপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমাকে আপনি শহীদী মৃত্যু প্রদান করুন। কিন্তু যে পর্যন্ত বনূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমার চোখ শীতল না হয় সে পর্যন্ত যেন আমার মৃত্যু না হয়।

আল্লাহ্ পাক তাঁর দোয়াই গ্রহণ করেছেন।---আহ্যাবের এ যুদ্ধকেই কাফিরদের সর্বশেষ আক্রমণে পরিণত করেন। এরপর থেকেই মুসলমানদের বিজয়াভিযানের সূচনা হয়---প্রথমে খায়বার, অতপর মক্কা মুকাররামাহ্ এবং এরপর অন্যান্য দেশ ও নগর অধিকারভুক্ত হয়; এবং বনূ কুরায়যার ঘটনা যা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে তাদেরকে বন্দী করে আনা হয়; এবং তাদের ব্যাপারে মীমাংসার ভার হযরত মা'আয (রা)-এর উপর ন্যস্ত হয়। তাঁর মীমাংসানুযায়ী এদের যুবক শ্রেণীকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও বালকদেরকে বন্দী করে রাখা হয়।

আহ্যাবের এই ঘটনাকালে সাহাবায়ে কিরাম ও রসূলুল্লাহ্ (সা) সারারাত পরিখা দেখাশোনা করতেন। কোন সময় বিশ্রামের জন্য ক্ষণিকের তরে শয়ন করলেও কোন দিক থেকে ক্ষীণতম হট্টগোলের আভাস পেলেই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ময়দানে চলে আসতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) ইরশাদ করেছেন যে, একই রাতে কয়েকবার এমন হত যে, তিনি ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য তশরীফ আনতেন এবং কোন শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে যেতেন। আবার ফিরে এসে আরামের জন্য শয্যায় খানিকটা গা লাগাতেন, পুনরায় কোন শব্দ পেয়েই বাইরে তশরীফ নিতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন যে, আমি অনেক যুদ্ধে---যথা খায়বারের যুদ্ধ, হোদায়বিয়া, মক্কা বিজয়, হুনায়নের যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সা)-র সংগে ছিলাম; কিন্তু তিনি অন্য কোন যুদ্ধে খন্দকের (পরিখার) যুদ্ধের ন্যায় এত দুঃখ

কষ্টের সম্মুখীন হন নি। এ যুদ্ধে মুসলমানরা নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়---প্রচণ্ড শীতের কারণে ভীষণ যন্ত্রণা পোহাতে হয়। তদুপরি খাওয়া-দাওয়ার দ্রব্যসামগ্রীও ছিল একেবারেই অপর্যাপ্ত।---(মাযহারী)

এই জিহাদে রসূলুল্লাহর চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়ঃ একদিন বিপক্ষ কাফিররা স্থির করল যে, তারা একবার সকলে সমবেতভাবে আক্রমণ করে কোন প্রকারে পরিখা অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হবে। এরূপ স্থির করে মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড ও নির্মম আক্রমণ চালায় এবং সর্বত্র ব্যাপকভাবে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। এ নিয়ে রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে সারাদিন এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় যে, নামায পড়ার পর্যন্ত সুযোগ পান নি। সুতরাং ইশার সময় চার ওয়াক্ত নামায একই সাথে পড়লেন।

রসূলুল্লাহ (সা)-র দোয়াঃ যখন দুঃখ-যন্ত্রণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে, তখন নবীজী সম্মিলিত কাফির বাহিনীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ এবং মুসলমানদের বিজয়ের জন্য মসজিদে ফাতবের ভিতরে সোম, মংগল ও বুধ---একাধারে এই তিনদিন বিরামহীন-ভাবে দোয়া করতে থাকেন। তৃতীয় দিন যোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে দোয়া কবুল হয়। রসূলুল্লাহ (সা) সহাস্য বদনে প্রফুল্লচিত্তে সাহাবায়ে কিরামের নিকটে তশরীফ এনে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন। সাহাবায়ে কিরাম বলেন যে, এর পর থেকে কোন মুসলমানের কোন প্রকারের কষ্ট হয়নি।---(মাযহারী)

সাফল্য ও বিজয়ের মাধ্যম এবং সূত্রসমূহের বহিঃপ্রকাশের সূচনাঃ গাতফান গোত্র ছিল শত্রুপক্ষের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে এ গোত্রভুক্ত 'নুয়াইম বিন মাসুদ' নামক জনৈক ব্যক্তির অন্তর ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত করে দেন। তিনি হযূর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এখনো আমার গোত্রের কেউ আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারেনি---এখন আমাকে মেহেরবানী করে বলে দিন যে, আমি এ পর্যায়ে ইসলামের কি খিদমত করতে পারি। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন যে, তুমি একা মানুষ---এখানে বিশেষ কিছু করতে সক্ষম হবে না। নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে তাদের মাঝে অবস্থান করেই ইসলামের স্বার্থে যা সম্ভব হয় তাই কর। নুয়াইম (রা) অত্যন্ত বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। মনে মনে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্ব-গোত্রীয়দের মাঝে গিয়ে যা ভাল বিবেচিত হয় তাই বলা ও করার অনুমতি চাইলেন। হযূর (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন।

বনূ কুরায়যার সাথে নুয়াইমের অন্ধকার যুগ থেকেই নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাদের নিকট গিয়ে তিনি বললেন---হে বনূ কুরায়যা! তোমরা ভালভাবেই জান যে, আমি তোমাদের বহু পুরাতন বন্ধু। তারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলল, আপনার বন্ধুত্ব ও কল্যাণবোধ সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অতপর হযরত নুয়াইম (রা) বনূ কুরায়যার নেতৃবৃন্দকে নিতান্ত উপদেশপূর্ণ ও কল্যাণ কামনার সুরে জিজ্ঞেস করলেন